মা আমার মা

মূল : মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান

অনুবাদ : মোবাশশেরউর রহমান

মূল প্রকাশক ঃ
লন্ডন মসজিদ
১৬, গ্রেসেন হল রোড
এর
অনুমোদনক্রমে

প্রকাশনায় ঃ
মাহবুব হোসেন
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রথম প্রকাশ ঃ
বাংলায় ১৯৮৭ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
৩১ জানুয়ারী ২০০৮ ইং

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৫০/-

২০০০ কপি

মুদ্রণে ঃ
আহমদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দু'টি কথা

স্যার জাফরুল্লাহ্ খানের **"মাই মাদার"** বইটি এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করার পর পরই এটি বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি ইচ্ছা আমার মনে উদিত হয়। আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ সাহায্য ও ফজল না হলে এর অনুবাদ করার আমার কোন নিজস্ব যোগ্যতাই ছিল না। মূল বইটি হাতে নিয়ে এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর আমি যেন কম পরিশ্রমেই পার হয়েছি। আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব ছিল না।

মূল বই স্যার জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের **'মাই মাদার'** ইংরেজীতে প্রকাশ করা হয় ১৯৮১ ইং সালে লন্ডনে । তাতে দেখা যায় তার আগে বইটির মূল ও সংক্ষিপ্ত উর্দু সংস্করণ পাকিস্তান থেকে ১৯৩৮ ইং সনে বেরিয়েছিল। বইটি যদিও নিজের মায়ের এক চলমান ছবি হিসাবেই লেখা হয়েছিলো ; কিন্তু তাতে বিশ্বের প্রথম সারির একজন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। বিশ্ব আদালতের প্রধান বিচারপতি, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি, তিনটি দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রাপ্ত বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সম্মানসূচক ডক্টরেট ইত্যাদি থেকেই এই মহান ব্যক্তির অবস্থান অনুমেয়। এদেশের বয়োজ্যেষ্ঠদের অনেকের মুখেই এখনো স্যার জাফরুল্লাহ্র কথা কিংবদন্তীর মতো শোনা যায়। বিশেষ করে জাতিসংঘে কাশ্মীর বিষয়ক বিতর্কে তার ভূমিকা, আফ্রো- এশিয়ার মুক্তিকামী দেশগুলোর স্বাধীনতার জন্য তার বিশেষ অবদানের কথা এখনো আরব ও আফ্রিকার দেশগুলোতে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। তার ব্যক্তিগত জীবনের উচ্চমার্গের কথা আমরা সবাই জানি। এহেন বিশ্ব ব্যক্তিত্বের সত্যিকার বিকাশের ক্ষেত্রে তার মায়ের অবদানের কথা আমরা এই বইটিতে পাই।

আশা করি বইটি পড়ে এদেশের সকল মায়েরা সন্তান পালনের ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারবেন। সকল সন্তানেরা নতুন করে নিজেদের মায়ের দিকে তাকাবেন। সকল মাতাপিতার জন্য এতে রয়েছে অনুপম শিক্ষা। সেই সত্যিকার শিক্ষা সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক এই আমাদের কামনা।

বইটি বাংলা অনুবাদের একটি সংস্করণ প্রকাশ করার অনুমতি আমাদেরকে চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) দিয়েছিলেন। তাঁর সেই অনুগ্রহের জন্য আমরা তার কাছে চির কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশে 'মা আমার মা' নামে বইটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন 'মেধা বিকাশ প্রকাশনী' চট্টগ্রাম থেকে ১৯৮৭ সালে।

অনুবাদের ব্যাপারে আমি পুরোপুরি 'সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স' অনুবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছে। কেননা এটি এমনই একটি বই যার সামান্যতম অর্থের পার্থক্য ঘটানো এক বিরাট অপরাধের শামিল বলে আমি মনে করেছি। তাই বইটির প্রতিটির সত্যকে ঠিক চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ সাহেব যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবে রাখতে গিয়ে এর সাবলিল স্বাচ্ছন্দ্য রাখতে কতটুকু সফল হয়েছি তার বিচারের ভার পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। কোন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকদের কাছে মার্জনা চাই। সব বাঙ্গালী পাঠক বইটি পড়ে উপকৃত হবেন অন্তরে এই কামনা রাখছি।

এই বইটি দ্বিতীয়বার প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেছেন, মোহতারাম মাহবুব হোসেন সেক্রেটারী ইশায়াত, বাংলাদেশ, মোহতারাম তাসাদ্দক হোসেন, সেক্রেটারী তবলীগ, বাংলাদেশ। প্রুফ দেখেছেন, মাহমুদ আহমদ সুমন ওয়াকফে জাদীদ মোয়াল্লেম, এ ছাড়াও যারা এ পুস্তকের প্রকাশনার কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রত্যেককে উত্তম পুরস্কার দান করুন, আমীন।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর

৩১ জানুয়ারী ২০০৮ইং আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ।

সূচী পত্র

* লেখকের কথা..... ৭
* শুরুর আগে..... ১১
* বিশ্বাসের পরীক্ষা..... ১৫
* নৈতিক শিক্ষা..... ২২
* আধ্যাত্মিক স্বর্গ..... ২৬
* আত্মোৎসর্গীকৃত মা..... ৩৫
* বাবার শেষ দিনগুলো..... ৪৫
* আমার বাসায় মায়ের আবাস..... ৫৪
* স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী..... ৫৯
* স্বপ্নের বাস্তবায়ন..... ৬৮
* স্বপ্নের পরিপূর্ণতা..... ৭৭
* পরম বিশ্বস্ততা ও সহানুভূতি..... ৮৯
* বিবিধ..... ১০১
* বিদায়..... ১১২

লেখকের কথা

আমার মা ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মে পরলোক গমন করেন। সে বৎসরের শেষ দিকেই উর্দুতে মায়ের জীবনের সংক্ষিপ্ত আলেখ্য লিখেছিলাম, যার মুখবন্ধ হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশির আহমদ সাহেব তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

"চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব এক ছোট্ট পরিসরে এই পুস্তিকায় যেভাবে তার মায়ের জীবনের চলমান আকর্ষণীয় ঘটনা প্রবাহকে তুলে ধরেছেন তাতে মায়ের প্রতি সন্তানের যে দায়িত্বই শুধু পালন করা হয়েছে তাই নয় বরং এই আন্দোলনের প্রতিও এক মূল্যবান সেবা করা হয়েছে। এ ধরণের সাহিত্য আল্লাহ্‌র ফজলে জামাআতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানদন্ডকে উচ্চতর ভিত্তির উপর স্থাপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। তাই আমি আশা করি সব বন্ধুরাই এই পুস্তিকাখানি পড়বেন এবং নিজেদের পরিবারের সদস্যদের তা পড়তে বলবেন, যাতে মহান আল্লাহ্‌র সাথে সত্যিকার ঐকান্তিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের পরম আগ্রহ ও কার্যক্ষেত্রে নিজেদের ভাল পিতা-মাতা ও ভাল সন্তান হিসাবে প্রমাণ করা এক উদগ্র আগ্রহ জেগে উঠে। কেন না সেই গুণটিই এই পুস্তিকায় অন্তর্নিহিত রয়েছে।

প্রার্থনা করি, এই এই পরম করুণাময় এই পরলোকগত ও তার পরলোকগত স্বামীর উপর তাঁর করুণারাশি বর্ষণ করুন এবং তার সন্তান সন্ততি ও আমাদের সকলকেই সৃষ্টি সেবা ও ধর্মের খেদমতের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে তাঁর রেজা (সন্তুষ্টি) অর্জনের যোগ্য করে গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন–আমীন।"

এই পুস্তিকাটি খুব জনপ্রিয় প্রমাণিত হয়েছে ফলে অনেকবার ছাপাতে হয়েছে। একবার সীমান্তের এক আফগান গোত্র প্রধান ঘটনাক্রমে এই বইয়ের একটি কপি পেলেন। তিনি এটা পড়ে এতই মুগ্ধ হয়ে ছিলেন যে নিজের খরচে তিনি এক হাজার কপি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁর নিজের পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই বইতে তিনি নিজে কিছু কথা যোগ করেছিলেন যার সরাসরি অনুবাদ হলোঃ

"করাচীতে আমার একজন বন্ধু **'আমার মা'** (মাই মাদার) নামক পুস্তিকাটি ধার দেন। এটা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই এবং অনেকবার এটা আমি পড়ি তারপর ঠিক করি এই বইটি আমি ফিরিয়ে দেবো না। কিন্তু আমার বন্ধু এটা ফিরিয়ে দিতে জেদ ধরে বসলো। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা আমাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। এরপর গোটা একটি বৎসর ধরে বইটি আমি খুঁজে ফিরেছি। শেষ পর্যন্ত অন্য এক বন্ধু দয়া করে এটা আমাকে ধার দিতে রাজি হন। সেটা থেকে এখন আমি এক হাজার কপি ছাপিয়েছি এবং আমার এই বন্ধুকে তার একটি বই ধার দেওয়ার বদলে তিনশত কপি দিতে মনস্থ করেছি যাতে তার অন্য যে কোন বন্ধুই বইটি পড়তে চাইবে সে যেন তাকে বিনা পয়সায় তা উপহার দিতে পারে।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে লেখকের অনুমতি নিয়েই এই পুস্তিকাটি আমার ছাপানোর উচিৎ ছিল। কিন্তু যেহেতু আমি এটি বিক্রির জন্য ছাপাচ্ছি না বরং সাধরণ মানুষ যেন বিনা পয়সায় এটা পেয়ে উপকৃত হয় সেটাই আমার লক্ষ্য। সেজন্য আমি বইটি ছাপিয়ে প্রকাশ

করার জন্য লেখকের অনুমতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি। আমি আহমদীদের কোন সন্তুষ্টি চাই না এবং অ-আহমদীদের মাঝে কোন কুখ্যাতিও নয়। সেজন্যই আমার নাম প্রকাশ করছি না। ছাপানো বইটি মূল বইয়ের হুবহু অনুলিপি। আমি শুধু লেখকের ও আমার একটি সংক্ষিপ্ত উপক্রমনিকা লিখে দিলাম।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান **'আমার মা'** বইটিতে নিজের মায়ের জীবনের এক অতি সুন্দর রেখা চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই ধরনের বইয়ের মূল্যায়ণ করার মত জ্ঞান বা যোগ্যতা আমার নেই। তবে বইটি আমি বার বার পড়েছি এবং এ কথাটিই আমি বোঝাতে চাই এর একটি ছাপ আমার মনে গেঁথে আছে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে এই দূর্লভ রত্নের বহুল প্রচারে আমি কেন অনুপ্রাণিত হয়েছি? বইটি পড়ার পর প্রত্যেক পাঠক তা নিজেই বুঝতে পাড়বেন। এটা একজন আহমদী ভদ্রলোকের আহমদী মায়ের জীবনের রেখাচিত্র। কিন্তু যারা আহমদী অ-আহমদী পার্থক্য করেন না তেমন প্রতিটি মুসলমান পরিবারের জন্য এটি এক অমূল্য রত্ন। তাছাড়া আহমদী অ-আহমদী প্রতিটি গোঁড়া লোকের জন্যই এটি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি সহায়ক। এর অসংখ্য উপকারিতার জন্যই আমি জ্ঞানান্বেষুদের তৃষ্ণা নিবারণের সুবিধার্থে তাদের কাছে বিনামূল্যে এই বই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

সাহিত্যে আমার কোনই মেধা নেই। আমার হৃদয়ের আকুলতাকেই শুধু আমি সরল ভাষায় কাগজে লিখে বোঝাবার চেষ্টা করছি মাত্র। পর্দার অন্তরালের এক মহিলার আত্মোৎসর্গ, আত্মসম্মান, সাহসিকতা, সত্যতা, বিশ্বস্ততা ও ইসলামী বিধান অনুযায়ী আল্লাহ্র প্রতি অবিচল বিশ্বাসের এক জীবন্ত আয়না এই বইটি। মুসলিম মহিলা এ থেকে নিজেকে উপযুক্ত ভাবে গড়ে নেওয়ার পথ পাবেন।

মহিলারা সাধারণত কুসংস্কারের শিকার হন বেশী। হিন্দু মহিলারা এ ব্যাপারে সবাইকে হার মানান। তবে ভারতের ও পাকিস্তানের মুসলমান মহিলারাও তাদের হিন্দু ভগ্নীদের প্রভাবে এ ব্যাপারে বেশী পিছনে পড়ে নাই। মাতৃত্বের মুকুট লাভের লোভে তারা অতি সহজেই জাদুটোনা, তাবিজ কবজ, পীর-দরবেশের কবরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে জিয়ারত, তৈলের বদলে মাখন দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো, বিছানার বদলে মেঝেতে শোয়া ইত্যাদি কুসংস্কারগুলোর সহজ শিকার হন। কিন্তু এই বইতে জয়দেবী নামি এক হিন্দু মহিলা, যে নিজেকে ডাইনি প্রচার করতো এবং জাফরুল্লাহ্র মায়ের পর পর দু'টি সন্তানের জীবন সেই নিয়েছে বলে দাবী করতো তার প্রতি জাফরুল্লাহ্ খানের মায়ের মনোভাবের পরিচয় পাই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র একত্বের বিশ্বাসের দূর্বলতা বা কুসংস্কারজাত প্রতিটি আচরণ তিনি দৃঢ় চিত্ততার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাকে দূর্বল করে স্বার্থ আদায়ে জয়দেবীর ক্রমাগত প্রচেষ্টাকেও তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

তার ছিল গভীর মানবপ্রীতি। আহমদীদের বিরুদ্ধবাদী দু'জন আহরার এ ব্যাপারে তার উদ্বিগ্নতা থেকেই তা জানা যায়। একবার তো তিনি তাদের পারিবারিক কাজের মিয়া জুম্মনকে এক আহরার মোল্লার নাতি নাতনীদের প্রতি উপহার প্রেরণে বাধা দিতে চাওয়ায় তিরস্কার করেছিলেন। আর একবার এক মহাজনের ঋণ শোধ করার ব্যর্থ হওয়ার কারণে যখন একজন বিরুদ্ধবাদী আহরারের গরু বাছুরগুলি বেধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন

তিনি সেই মহাজনকে টাকা পরিশোধ করে গরু বাছুরগুলো ফেরৎ নিয়ে দিয়েছিলেন। এটাই সেই ধরনের আচরণ যা ইসলামকে বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথক করে। তার সত্যিকার সহানুভূতি সব ধর্মীয় মতাদর্শগত দলাদলী বিভেদের উর্ধ্বে উঠে মানবতাকে কোলে তুলে নিয়েছিলো।

স্বপ্নের প্রতি আমার কোন আস্থা ছিল না–বা এটাকে তেমন কোন গুরুত্বও কোন সময় দিতাম না। কিন্তু এই পুস্তিকায় তার যে স্বপ্নগুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিপূর্ণতা জাজ্জল্যমান, সেগুলো স্বপ্নের প্রতি আমার মনোভাব পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। এখন আমি নিশ্চিত যে সৎশীল বান্দা , যাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তাআলার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তাদের সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কোন ঘটনার সম্বন্ধে পূর্বজ্ঞান দ্বারা অনুগৃহীত করা হয়।

মানুষের প্রতি তার গভীর দরদের দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি উদাহরণ বইটিতে রয়েছে। এক গ্রাম্য মহিলাকে ব্যথায় কাতরাতে দেখে তিনি তার কারণ খুঁজে দেখেন যে ঐ মহিলার খালি পায়ের বেশ গভীরে একটি লম্বা লোহার শলা ফুটে রয়েছে–তৎক্ষণাৎ তিনি তা বের করতে লেগে গেলেন এবং বেদনার উপশম ও আরামের জন্য ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

আর একবার তিনি ভারতের গভর্ণর জেনারেলের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করে অত্যন্ত সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার সাথে তার মনে বেদনার কারণ হয়েছিলো এমন একটি বিষয়ে কথা বলেছিলেন। পর্দার অন্তরালের এক মহিলা যার বহির্বিশ্বের সাথে তেমন কোন যোগাযোগই নেই তার পক্ষে এটা ছিলো এক অদ্ভুত সাহসিকতার নমুনা যা আমাদের ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমান নর নারীদের আচরণের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় এই পুস্তিকাটির সবটুকুই একটি শিক্ষা, একটি উপদেশ, মৃদু ভৎসনা, একটি প্রেরণা। প্রতিটি পৃষ্ঠাই যেন বলছে যে এটা যেমন তেমন করে পড়ার বই নয়। প্রত্যেক মুসলমান মহিলার জন্যই এতে রয়েছে একটি মহান বাণী। প্রতিটি মুসলমান যুবতীর ড্রেসিং টেবিল বা বুক সেলফ্-এর শোভা বর্ধনের জন্যই এই বইটির থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি মুসলমান পরিবারের জন্যই এটা থাকা আবশ্যক। প্রতিটি শিক্ষিত মহিলার উচিত, যে সব মহিলারা এটা পড়তে পারেন না, এটা পড়ে শোনানো। প্রতিটি শিক্ষিত পুরুষের জন্য এটা তাদের পরিবারের মেয়েদের কাছে পড়ে শোনানো অবশ্য কর্তব্য, যেন তারা ইসলামী মূল্যবোধের দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে উঠেন, প্রতিটি মুসলমান নারী যিনি মাতৃত্বের আশা করেন তার জন্য এই বই এক আলোক বর্তিকা স্বরূপ।

আমি আহমদীয়া জামাআতের কার্পণ্যে অবাক হয়েছি যে তারা উর্দুতে এ অমূল্য রত্নটি সীমিত সংখ্যক ছাপিয়েই সন্তুষ্ট রয়েছে এবং অ-আহমদীদের মাঝে এর ব্যাপক প্রকাশ করছে না অথচ আহমদী অ-আহমদীদের মধ্যে বর্তমান বিরাজমান অনেক ভুল বোঝাবুঝি এটা দূর করতে পারতো। এটা উর্দু, পস্তু, ফারসী ও আরবীতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া উচিৎ। আমি আমার নিজস্ব সম্পদের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করছি। তবু আমি আমার নিজের খরচে এর এক হাজার কপি অ-আহমদীদের মাঝে বিনা মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করছি। যদি মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বিশেষ করুণায় আমার তৌফিক দেন তাহলে

আমি সীমান্তের গোত্রগুলিতে শীঘ্রই এটা আরো বিতরণের আশা রাখি। আল্লাহ্ তাআলার দয়ার উপরই আমার ক্ষমতা নির্ভর করে।

চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান পাকিস্তান ও মুসলিম বিশ্বের জন্য যে মহান কর্মসাধন করছেন তা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা হবে। যে বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন সব দৃষ্টিকোন থেকে পরিপূর্ণ গভীরতায় প্রত্যয় উৎপন্ন করে ছেড়েছেন। তার বক্তৃতামালা সর্বদা বিপক্ষকে পরাভূত ও নির্বাক করে দিতো। প্রখ্যাত চিন্তাবিদগণ বলেন যে ঐশী সাহায্য ছাড়া এরূপ অদ্ভুত যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এই পুস্তিকাটি পড়ে আমিও বুঝতে পেরেছি যে এরূপ ধার্মিক মায়ের কোলে লালিত, তার স্তন্যের খাঁটি দুগ্ধের পালিত এরূপ শিশু খাঁটি গুণাবলিতে ভূষিত হতে বাধ্য। এমন একজন যিনি তার পুণ্যবান মায়ের দোয়ার সুরক্ষায় রয়েছেন এবং তার ধর্মগুরু-স্বীকৃত প্রার্থনা দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত, তার পক্ষেই ঐশী সাহায্য লাভ নিশ্চিত।"

–(সীমান্তে একজন অ-আহমদী আফগান)

মূল উর্দু বইটি লিখতে গিয়ে আমার আবেগের উপর এক প্রচন্ড টান সৃষ্টি হয়েছিলো। দীর্ঘ সময়ের আবর্তনে, তেতাল্লিশ বছর পরও সেই হৃদযন্ত্রণা অথবা বিচ্ছেদ বেদনার সামান্যতম উপশম হয়নি, যদি এক অত্যাশ্চার্য্য উপায়ে আমি সব সময়েই মায়ের সাথে মিলন অনুভব করে গেছি। বন্ধুবান্ধবেরা সব সময়েই আমাকে ইংরেজীতে মায়ের জীবনী লেখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। কিন্তু আমি সব সময়ই এই ভয়ে সংকুচিত হয়ে পড়েছি যে তাদের খাঁটি ভালবাসা সত্বেও আমার আবেগের উপর যে প্রচন্ড চাপ পড়বে তা হয়তো আমার সহ্য হবে না। ইদানিং কালের কিছু ঘটনাবলীর দ্বারা অবশ্য আমাদের মিলন ঘনিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে আর আবেগ ও অনুভূতির উত্তরোত্তর গভীরতার প্রতিক্রিয়াও দেখা যাচ্ছে। মনে হয় যেন কাউকেই অপছন্দ করার শক্তি আমার নেই। বরং সবার জন্যই দয়া, ভালবাসা সহানুভূতির একটি দিক হলো এই যে মায়ের একটি লিখিত চিত্র ইংরেজীতে আরো বৃহত্তর গন্ডিতে উপহার দেওয়া। আমি মনে করি সামান্য অজুহাতে এতোদিন আমি এই দায়িত্ব পালন থেকে বিরত ছিলাম এবং আমি মনে করি দেরীতে করলেও মার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হবে। আমি দোয়া করছি ঐশী অনুগ্রহে আমি যেন এই দায়িত্ব এমন ভাবে পালন করতে পারি যাতে তাঁর সন্তুষ্টি হাসেল হয় ও তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়–আমীন।

মূল উর্দু পুস্তিকার হুবহু অনুবাদ হিসাবে এটা লিখা হয়নি এবং সেই প্যাটার্নও অনুসরণ করা হয়নি যদিও সেই বইটি পুরোটিই এটাতে আত্মিকৃত হয়েছে। ইংরেজী ভাৎসনাটি অনেকটা পূর্ণাকৃতি, যদিও পুরাপুরি নয়। আমার বাবা ও আমি নিজে এইটিতে একটু বেশি জায়গা দখল করেছি যা উর্দু পুস্তিকায় করার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

জাফরুল্লাহ্ খান

লন্ডন

আগষ্ট, ১৯৮৯ ইং

অনুচ্ছেদ– ১

শুরুর আগে

পাকিস্তানের শিয়ালকোট জেলার দাস্‌কা (দক্ষ) অঞ্চলের শাহীজাট্ পরিবারের সন্তান আমি। প্রবাদ আছে যে, এই শাহীজাট্‌গণ এক সময় শাহীওয়াল অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিলো। আমাদের গোষ্ঠির শাহীগণ কয়েক পুরুষ ধরে দাস্‌কায় বসতি স্থাপন করেছিলো যার ফলে এই এলাকাটা (শহরটা) 'শাহীদের দাস্‌কা' নামে খ্যাত হয়ে পড়ে।

আমাদের পূর্ব পুরুষরা ছিলো হিন্দু। সময়ের আবর্তনে কিছু পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, অন্য কিছু পরিবার শিখ ধর্ম গ্রহণ করে। শুধু মাত্র দুটি পরিবার হিন্দু ধর্মে থেকে যায়। সবচেয়ে প্রাচীন ও বয়োজ্যাষ্ঠ গোষ্ঠিটি শিখ হয়ে যায়। আমার দাদা চৌধুরী সিকান্দার খান পর্যন্ত আমাদের পরিবারের বার পূর্ব পুরুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিভিন্ন গোষ্ঠিতে বর্তমানে যারা জমিদারী করছিলো তাদের পূর্ব পুরুষ যে একজনই ছিলো তা সবাই জানতো আর তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধ মেনে চলা হতো। আমার পিতার সময় পর্যন্ত কৃষিকাজই জীবিকা উপার্জনের প্রধান উপায় ছিলো। চারজন গোষ্ঠি প্রধান ছিলো আর আমার দাদা ছিলো তার একজন। দাদার পর আমার বাবা গোষ্ঠি প্রধান হন তারপর আমি। কিন্তু আমার পরবর্তী ছোট ভাই-এর স্বপক্ষে আমি তা ত্যাগ করি। আর ১৯৭৪ সালে তার মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে গোষ্ঠি প্রধান হয়।

যৌবনেই আমার বড় বাবা (দাদার বাবা) মারা যান আর পিছনে রেখে যান বিধবা স্ত্রী, দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। ছেলেরা তখনো বিশেষ কোঠা পেরোয় নি। তাদের বড়জন আমার দাদা, পিতার স্থলে গোষ্ঠি প্রধান হন। পরিবারটি তখন উন্নতির দিকে যাচ্ছিলো, আর্থিক স্বাচ্ছন্দও ছিলো। কিন্তু বড় বাবার মৃত্যুর পর অবস্থা দোদুল্যমান হয়ে পড়ল। বড় বাবার বিধবা পত্নী ছিলো খুবই উদ্যমী ও গুণবতী মহিলা এবং তার সন্তানদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তখন ছিলো শিখ রাজত্বের সময় আর যেহেতু প্রধান গোষ্ঠি-প্রধান ছিল শিখ তিনি তার মুসলমান গোষ্ঠি প্রধানের (আমার নাবালক দাদার) উপর সুযোগ নিত।

গোষ্ঠি প্রধানদের দায়িত্ব ছিলা কৃষকদের থেকে খাজনা আদায় করে সরকারী রাজকোষে জমা দেওয়া। প্রধান গোষ্ঠি প্রধান আমার নাবালক দাদার অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কৃষকদের দেরীতে খাজনা আদায় করার ফুসলানী দিতো। ফলে আমার দাদা সময় মত রাজকোষে খাজনা জমা দিতে পারতো না। ফলে রাজকর্মচারী খবর নিতে আসতো, দেরীর কারণ জিজ্ঞাসা করতো আর জোর করে খাজনা উসুল করে নিতো। তখন প্রধান গোষ্ঠি প্রধান তাঁকে পরামর্শ দিতো

আমার দাদাকে তার মায়ের সামনে আচ্ছা ধোলাই দিতো, যাতে তার মা'র যা কিছু আছে তা বিক্রী করে খাজনা আদায় করতে বাধ্য হতো। প্রথম ছ'মাসেই এই করুন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো। আর আমার দাদার মা তার গহনা পত্র সোনা-দানা বিক্রি করে খাজনা আদায় করতে বাধ্য হতো। প্রধান গোষ্ঠি প্রধানের ইচ্ছা ছিলো যাতে এই পরিবারটি জমিজমা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু তার আশা খুব বেশী পূরণ হয়নি। এই অপরাজেয় মহিলাকে ভূসম্পত্তির বেশ কিছু অংশ বিক্রী করতে হয়েছিলো। ফলে তার সন্তানদের পৈত্রিক সম্পত্তির পরিমাণ কমে গিয়েছিলো। ইতিমধ্যে ছেলেরা বড় হয়ে উঠছিলো। আর বড় ছেলেটি যে গোষ্ঠি প্রধান হয়েছিলো, তার চমৎকার গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছিলো। সে ছিলো তার তখনকার বয়সের তুলনায় অনেক দুরদৃষ্টি সম্পন্ন, দৃঢ় চেতা সত্য ও জ্ঞানী এবং আতিথেয়তা ছিলো তার প্রধান গুণ। তাদের আয় কমে যাওয়ার ফলে অনেক সময় তাদের খুবই কৃচ্ছতা করতে হতো। কিন্তু তাদের বাড়ীতে অতিথিদের সব সময় ভালভাবে রাখা হতো।

আমার দাদা রাতের বেলা অপরিচিতের মত অতিথিশালায় যেতেন এবং অতিথিদের সুযোগ সুবিধা দেখতেন এবং নিজের হাতেও তাদের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করতেন। প্রত্যেক ধরনের দুঃখ কষ্টের প্রতি তার ছিলো অপরিসীম সহানুভূতি আর তা দূর করার জন্য তার সাধ্যমত তিনি সবকিছু করতে প্রস্তুত হয়ে যেতেন। একদিন সকালে অতিথি শালার চাকর এসে খবর দিল যে একজন অতিথি ভোরেই বিছানার লেপ নিয়ে চলে গিয়েছে। ঘটনা ধরা পরার পর লোকটিকে ধরার জন্য চৌকিদারকে পাঠানো হয়েছিলো। ইতিমধ্যে লোকটি সহ চৌকিদার এসে পড়েছিলো। লোকটির বগল তলায় লেপটি দেখা যাচ্ছিলো। তাকে প্রশ্ন করে জানা গেল তার বাড়ী প্রায় তিন মাইল দূরের এক গ্রামে। সে খুবই গরীব, তার স্ত্রী ও দুটি ছেলে মেয়ে আছে কিন্তু এই শীতে গায়ে দেয়ার মত তাদের লেপ একটিই মাত্র। এই কথা শুনে আমার দাদা তাকে এই ব্যাপারটি জানিয়ে তার সাহায্য না নিয়ে চুরি করার জন্য তাকে তিরস্কার করলেন। তার পর তাকে লেপটি দিয়ে দিলেন। সঙ্গে তিনটি টাকাও দিলেন, তখন সম্ভবতঃ তার কাছে ঐ কটি টাকাই ছিলো।

আমার দাদা ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন এবং নিজের জীবন আল্লাহর ভয়ে ও পবিত্রতার মধ্যে কাটিয়ে গিয়েছেন। প্রত্যেক প্রকার কুসংস্কার ও নববিধান (বেদাত) এবং আল্লহর সঙ্গে সামান্যতম শরীক করা হয় এমন সবকিছু তিনি পরিহার করে চলতেন। সময়ের বিবর্তনে তার সুখ্যাতি শুধু তার নিজের জেলাতেই নয় বরং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতেও ছড়িয়ে গিয়েছিলো। দাস্কার শিকদার খানের ন্যায়-পরায়ণতা, ধর্মভীরুতা, দানশীলতা, মহানুভবতা ইত্যাদি গুণাবলীর কথা জনশ্রুতি হয়ে পড়ল।

আমার দাদী ছিল শিয়ালকোট জেলার 'দাতা জাইদকা' অঞ্চলের 'বাজওয়া' পরিবারের মেয়ে। তার গর্ভ থেকে দুটি পুত্র ও দুটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। সবার বড় সন্তান ছিল আমার পিতা নাসরুল্লাহ্ খান, তার জন্ম হয়েছিলো ১৮৬৩ইং সালে। দাদা তার প্রথম পুত্রের সম্বন্ধে খুব উচ্চাশা রাখতেন তাই তাকে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করেন এবং পরে আরো উচ্চ শিক্ষার জন্য লাহোর পাঠিয়ে দেন। স্থানীয় স্কুলে তিনি এত ভাল ফল করেছিলেন যে তাকে তৎকালীন মাসিক দু'টাকার একটি স্কলারশীপ দেওয়া হয়েছিলো। লাহোর পাঠানোর সময় তাকে বলা হয়েছিলো যে এই স্কলারশীপের দু'টাকার আর কোনক্রমে বেচে থাকা যায় সেই পরিমাণ গমের আটা দিয়েই তাকে চলতে হবে। পরে আমি তার কাছে শুনেছিলাম যে, যে ছয় বৎসর তিনি লাহোরে পড়াশুনা করেছিলেন তার মধ্যে একদিনও তিনি পেটভরে রুটি খেতে পারেন নি।

দাস্কা থেকে লাহোর যাওয়ার জন্য সবচেয়ে কাছের রেলষ্টেশন ছিলো 'পুজরানওয়ালা' যার দুরুত্ব দাস্কা থেকে ১৪ মাইল। বই পত্র ও অন্যান্য মালপত্রের ভারী বোঝাটি বহন করে আমার পিতাকে প্রায়ই এই দুরত্ব হেটে আশা যাওয়া করতে হতো। ট্রেন ভাড়ার একটি পয়সা বাঁচাবার জন্য প্রায়ই তিনি গুজরান ওয়ালা থেকে 'শাহদারা' পর্যন্ত টিকিট করতেন তারপর সেখান থেকে চার মাইল পথ পায়ে হেটে লাহোর শাহী মসজিদের কাছে তার হোস্টেলে পৌঁছতেন।

লেখাপড়া তিনি খুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে করতেন ফলে নর্মাল স্কুল ওরিয়েন্টাল কলেজ অব 'ল' কলেজের স্তরগুলো তিনি সাফল্যের সঙ্গে স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করে যান, যার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল মাসিক ৪ টাকা ৬ টাকা ও শেষে ৮ টাকায়। তখনকার দিনে স্থানীয় স্কুলে ইংরেজী পড়ানো হতো না তাই আমার বাবাকে লাহোরে দেশীয় ভাষায় পড়াশুনা করতে হয়েছিলো। তাই যখন 'ল' পড়তে গেলেন তখন অনেক বইপত্র শুধুমাত্র ইংরেজীতেই পাওয়া যেতো বলে তার সাংঘাতিক অসুবিধা দেখা দিলো। কোন সময় তিনি লালা লাজপত রায়, যিনি খুব ভাল ইরেজী জানতেন এবং আমার বাবাকে শিখাবার জন্য সময় দিতে রাজী হয়েছিলেন, তার কাছে যাওয়ার জন্য অনেক দূর ভ্রমণ করে 'হিসার' পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। তখন হিসার পর্যন্ত রেললাইনও ছিল না। যাই হউক তার শত অসুবিধা ও বিঘ্ন কাটিয়ে তিনি দু'টি 'ল' পরীক্ষায়ই ইংরেজী মাধ্যমের ছাত্রদের ডিঙ্গিয়ে রূপা ও সোনার মেডেল নিয়ে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন। তৎকালীন নিয়মে প্রথম 'ল'পরীক্ষার পর তিনি নিম্ন আদালতে আইন ব্যবসায় যোগ্যতা অর্জন করেন। তাই তিনি দাস্কায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। 'ল'পরীক্ষায় দ্বিতীয় পর্ব পাশ করার পর তিনি পূর্ণ আইনজীবী হিসাবে শিয়ালকোট চলে আসেন এবং এখানেই স্থায়ী হন। এইখানে এসে তিনি ভালভাবে ইংরেজী শেখা আরম্ভ করেন

এবং ইংরেজীতে এতো দক্ষতা অর্জন করেন যে টেক্সট বই ও 'ল' রিপোর্টের একটি লাইব্রেরী তৈরী হয়ে যায়।

যখন তিনি লাহোরে ছাত্র ছিলেন তখনই তিনি তার মামাত বোন হুসেন বিবিকে বিবাহ করেন। হুসেন বিবি ছিল তার সবচেয়ে ছোট মামা চৌধুরী ইলাহী বকস্ সাহেবের বড় মেয়ে। তাদের বাড়ী ছিল দাতা জাইদকা অঞ্চলে। তারা দু'জন সমবয়সী ছিলেন। আমার মা আমার বাবার চেয়ে মাত্র দশ দিনের ছোট ছিলেন। বিয়ের সময় তাদের বয়স ছিল ১৭/১৮ বৎসর।

মা'র পরিবার মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। পরিবারে সবচেয়ে ছোট ছেলের বড় মেয়ে হিসাবে তার আদর ও প্রশ্রয় ছিল খুব বেশী। তার বড় চাচা তাকে খুব ভাল বাসতেন। যদিও তার বড় চাচার দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল, তথাপি আমার মাকেই তিনি বেশী আদর আহলাদ দিতেন। আমার মায়ের পরে আরো তিন বোন, এক ভাই ও সর্বশেষে আরেক বোন হয়। আমার নানী ছিলেন অত্যন্ত ধার্মীক ও পূণ্যবতী মহিলা, যিনি শিশুদের চিকিৎসার ব্যাপারে তার পিতার নিযুক্ত ডাক্তারের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আমার মা নানীর কাছ থেকে তার কিছু কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

মা-এর বিয়ের পরে বাপের বাড়ীর নিশ্চিত ও স্বাধীন জীবন ছেড়ে শ্বশুর বাড়ীতে শ্বশুর-শ্বাশুরীর সঙ্গে থাকতে চলে এলেন। তখন তার স্বামী একজন ছাত্র ও বাড়ী থেকে দূরে থাকেন। তার শ্বশুর (আমার দাদা) তাকে খুব ভালবাসতেন এবং সাধ্যানুযায়ী তার আদর আপ্যায়ণের দিকে নজর দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু আমার মা নিজেকে শ্বশুর বাড়ীর কৃচ্ছতার জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন এবং নিজের জন্য কোন কিছুই চাইতেন না। এমন কি যখন তার শাশুড়ী কোন কিছু নিয়ে এসে বলতেন 'তুমি কি এটা নিতে বা খেতে পছন্দ কর? তখন বলতেন– 'না মা, এটা আমার তেমন পছন্দ নয়'। অথচ যদি প্রশ্ন না করে এটা তাকে দেওয়া হতো তা হলে তিনি খুব খুশী হয়েই এটা নিতেন।

গৃহস্থালীর সব কাজেই তিনি সাহায্য করতেন এবং কোন কিছুতেই অবহেলা করতেন না। ফজরের আজানের দু'ঘন্টা আগে ঘুম থেকে জেগে তিনি নিজের হাতে মাড়াই কলে (যাতায়) শস্য পিষতেন, আজানের পর তিনি তা বন্ধ করতেন। বাপের বাড়ী তিনি কদাচ বেড়াতে যেতেন। তাও যখন তাকে 'নাইয়র' নেওয়া হতো। সেখানে তিনি বেশী দিন থাকতেন না, যদিও দাস্কার তুলনায় জীবন সেখানে ছিল অনেক বিলাসবহুল ও সুখময়। তিনি জানতেন তার দায়ীত্ব প্রতিপালনের স্থান কোথায় এবং তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

অনুচ্ছেদ-২

বিশ্বাসের পরীক্ষা

একটি শিশুপুত্রের আগমণ ছিল আমার মা'র জন্য আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ রহমতেরই প্রকাশ এবং তার হৃদয় স্রষ্টার প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর সাথে দীর্ঘ বিচ্ছেদের দিনগুলো এতে অনেকটা সহনীয় হয়ে উঠল। তাদের বন্ধনও এতে যেন আরো দৃঢ়তর হলো। ছেলেটির নাম রাখা হলো জাফর। আর প্রথম দিন থেকেই ছেলেটি দাদার হৃদয়ের সবচেয়ে বড় স্থানটি দখল করে নিল। বাবা-মায়ের চোখের জ্যোতি এই ছেলেটি তাদের জীবনে নতুন আশা ও দিশার সন্ধান দিল, যদিও তাদের একজন বেশীর ভাগ সময় সুদূর লাহোরে ও অন্যজন তাকে কোলে করে রাখতো।

জাফরের বয়স মাত্র কয়েক মাস তখন একবার মা'কে তার বাপের বাড়ী 'দাতা জাইদকা' যেতে হলে সঙ্গে জাফরও গেল, গেল নানা নানীর বহুপ্রতিক্ষিত আদরের পুত্তলী হয়ে-তাদের হৃদয়কে আনন্দে উদ্বেলিত করে দিতে। কিন্তু হায়, এ কি হলো! সেই সময় সেই গ্রামে 'জয় দেবী' বলে এক হিন্দু বিধবা রমণী ছিল, ইতিমধ্যে ডাইনী বলে যার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। নিজের এই বদনামকে ঢাকার চেষ্টা তো দুরের কথা সে এই নামের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ, নিরক্ষর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েদের ঠকিয়ে বা ভয় দেখিয়ে আয় উপার্জন করতে শুরু করলো। জাফর ও মা এই গাঁয়ে আসার দু'এক দিনের মধ্যেই একদিন 'জয় দেবী' এসে উপস্থিত হলো মায়ের কাছে, মাকে নমস্কার জানিয়ে কর্তৃত্বের সুরে কিছু কাপড়-চোপড় ও আরো কিছু জিনিষ চেয়ে বসল। উত্তরে মা যা বলেছিলো তা হলো, তুমি একজন দরিদ্র বিধবা। সেই হিসাবে খুশী মনেই আমি তোমাকে কিছু সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি তোমার ডাইনীত্বে বা আমার কোন ক্ষতি করার সামর্থে বিশ্বাস করি না। আমি জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লহকেই মানি। এ ব্যাপারে অন্য কারও অধিকার আছে বলে মানি না। ঐ রকম বিশ্বাসকে আমি ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য মনে করি। তাই এই রকম ভাবে আমি তোমাকে কিছু দিতে পারি না। তাতে জয় দেবী বলল– 'তুমি আবার চিন্তা করে দেখ। তুমি যদি সন্তানের জীবন চাও তাহলে আমার জিনিষগুলি তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও'। কয়েক দিনের মধ্যেই সেই জয় দেবী আবার আসলো। মা তখন জাফরকে গোসল করাচ্ছিল। জাফরের দিকে ইঙ্গিত করে জয় দেবী বললো, 'এই তাহলে শাহী'দের রাজপুত্তুর (তাদের শাহী জাঠ্ পরিবারের দিকে ইঙ্গিত করে)। মা বললেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

তখন জয় দেবী তার ঐ দিনের দাবীর পুনরাবৃত্তি করলো। মাও সেই একই উত্তর দিলো। এতে জয় দেবী অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বিড়বিড় করে বললো:

'ঠিক আছে যদি তুমি এই বাচ্চাকে জীবিত ফেরৎ নিয়ে যেতে পার তবে আমার নাম জয় দেবী নয়' এই বলে জয় দেবী হন্ হন্ করে চলে গেল। মাও বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা হতে পারে। কিন্তু মায়ের কথা শেষ হতে না হতেই, জয় দেবী তখনো বাইরের গেটের ভেতরেই ছিল এবং জাফরের গোসলও শেষ হয় নাই, জাফর হঠাৎ করে বমি করলো– রক্ত বমি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাফরের সংজ্ঞা লোপ পেলো, আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জাফর মারা গেল। মা সেজদায় পড়ে বললো, 'আল্লাহ্ তুমি এই ধন দিয়ে ছিলে, আর তুমিই নিয়ে গেলে। আমি তোমার ইচ্ছাতেই সন্তুষ্ট। তুমি আমাকে ধৈর্য্য ধরার শক্তি দাও।' সন্তান হারা শোকাপ্লুতা 'মা' দাস্কা ফিরে এলেন।

এর দু'বৎসরের মাথায় আবার তার দ্বিতীয় ছেলে হলো। আগের চেয়েও সুন্দর নয়নমোহন। তার নাম রাখা হলো রফিক। দাদা বললেন এ যতদিন বড় হয়ে ছুটা-ছুটি করতে না পারছে আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে না পারছে ততদিন তোমার দাতা জাইদ্কা না যাওয়াই উচিৎ। তাই দু'বৎসর পর্যন্ত মা দাস্কাতেই থাকলেন। তারপর হঠাৎ একদিন তার নিকটাত্মীয় কেউ মারা যাওয়ায় তার শোকে মাকে দাতা জাইদ্কা যেতে হলো। দাদাতো প্রথমে রফিককে সঙ্গে দিতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু মা ছেলেকে ছেড়ে যেতে চাইছিল না বুঝতে পেরে রফিককে সঙ্গে দিতে রাজি হলেন এই শর্তে যে মা সাত থেকে দশ দিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

দাতা জাইদ্কায় বাপের বাড়ীতে আসার দু'এক দিনের মধ্যেই জয় দেবীর আবির্ভাব হলো। তার একই দাবী, তাকে তার দাবীমত জিনিষ পত্র দিতে হবে। মা এবারও একই উত্তর দিলেন।কিন্তু নানাজান বাধা দিয়ে বলল সে যা চায় তা দিয়ে দিলেই তো হয়। এটা আর কয় টাকার জিনিষ। যদি তোমার অসুবিধা মনে হয় তা হলে আমিই দিয়ে দিচ্ছি' মা বলল, 'না এটা টাকার প্রশ্ন নয়, বিশ্বাসের প্রশ্ন। আল্লাহ তাআলা ও তার শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি আমার বিশ্বাস ও আন্তরিকতার প্রশ্ন এটা। এটা কিভাবে হতে পারে যে এই দরিদ্র মহিলার হাতে আমার বাচ্চার জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে বলে আমি মেনে নেব? সেটা হবে সত্য থেকে বিচ্যুতি। আমার বাচ্চার জীবন আমার আল্লাহর হাতে। যদি তিনি বাঁচিয়ে রাখতে না চান পৃথিবীর কারো সাধ্য নেই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। আমি কোন মতেই আমার বিশ্বাসের সাথে আপোষ করবো না। এতে আমার বাচ্চা বাঁচে বা মরে তাতে কিছু যায় আসে না।'

এর তিন কি চার দিন পর মা স্বপ্নে দেখলেন এক মহিলা বিলাপ করছে আর বলছে যে জয় দেবী তার লিভার টেনে বের করে নিয়ে বাচ্চাকে মেরে ফেলেছে, আর এর জন্য কেউ তাকে কিছু বলছে না। যদি এটা গ্রামের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাচ্চার ক্ষেত্রে ঘটতো তাহলে তো ডাইনী জয়দেবীকে গ্রাম থেকে ঘোল ঢেলে বের করে দেওয়া হতো। মা স্বপ্নের মধ্যেই তাকে বললেন, জীবন ও মৃত্যু শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে জয়দেবীর এতে কোন হাত নেই। দেখ না আমার বাচ্চাও তো একই ভাবে মারা গেলো। কই আমি তো জয়দেবীকে দোষ দেই নাই। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের মধ্যেই তিনি দেখলেন তার ঘরের এক দিকের একটি জানালা খুলে গেল, আর তাতে জয়দেবীর মুখ ভেসে উঠল। জয়দেবী বলছে, এবারও যদি তুমি তোমার ছেলেকে জীবিত নিয়ে ফিরে যেতে পার তবে আমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে নই, আমাকে ধাঙ্গত্বের মেয়ে আখ্যা দিও। মা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন, দেখলেন ঘরের আলোটি নিভে গেছে। তিনি নানীকে ডাক দিলেন। নানী তাড়াতাড়ি আলো জ্বালালেন। তারপর দেখলেন রফিক রক্ত বমি করে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। মা ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন এই ভেবে যে দাদার অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও রফিককে নিয়ে বাপের বাড়ী এসে এখন যদি রফিক এখানে মারা যায়, তাহলে তার শ্বশুর তাকে কখনো ক্ষমা করতে পারবেন না। আর আস্‌কায় শ্বশুর বাড়ীর জীবনও তার কাছে দূর্বিসহ হয়ে উঠবে। মা নানীকে বললো যেন তাড়াতাড়ি দাস্‌কায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দাতা জাইদকা থেকে দাস্‌কা গ্রাম্য পথে প্রায় বাইশ মাইল পথ। সঙ্গে সঙ্গে দুটো টাট্টু ঘোড়া তৈরী করা হলো। মা ও মেয়ে, মেয়ের কোলে অজ্ঞান শিশু পুত্র ঘোড়ায় চড়ে দু'জন সাহসের সাথে শেষ রাত্রেই যাত্রা করলো। দু'জনেই নীরব, বিষন্নহৃদয়। যখন ভোর হয়ে আসছে মা অনুভব করলো রফিকের মধ্যে জীবনের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। সে সম্পূর্ণ অবস হয়ে আছে। মা ভাল ভাবেই বুঝতে পারলেন যে রফিকের শেষ অবস্থা এসে উপস্থিত হয়েছে। তবে তিনি এটাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তার জীবনকে আরো কিছু দীর্ঘ করে দিতে পারেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাগামটি ছুড়ে ঘোড়ার গলায় ফেলে দিয়ে হাত উঠালেন, প্রভু আমার! তুমি তো জান যে বাচ্চার এই পরিনতির জন্য আমি শোকার্ত নই। তোমার যদি এই ইচ্ছা হয় যে তুমি একে তুলে নিবে, আমি তাতেই আত্মসমর্পিত। আমি শুধুমাত্র আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি। যদি এই বাচ্চাকে এখনই তুলে নাও দাস্‌কায় আমার অবস্থা কি হবে তা আমি বুঝতে পারছি। হে পরম ক্ষমাশীল তুমিই তো জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তোমার কাছে আমার কাতর মিনতি এই সন্তানকে তুমি আরো দশ দিনের আয়ু বাড়িয়ে দাও, যেন তার দাদা তার সোহাগ পেতে পারে। তারপর তুমি যদি তাকে

তুলে নেওয়ার ইচ্ছা কর আমি একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেলবো না। মা কতক্ষণ দোয়ায় মগ্ন ছিল জানেন না। তিনি দোয়ায় মগ্ন অবস্থায়ই হঠাৎ আঁচলে টান পড়লো। আর অনেকটা সুস্থ বাচ্চার মতই রফিকের 'মা' 'মা' ডাক শুনতে পেলেন। মা বুঝতে পারলেন তার দোয়া কবুল হয়েছে। স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় আপ্লুত হয়ে গেল।

দাদা তাদের নির্দিষ্ট সময়ের আগে ফিরতে দেখে খুবই খুশি হয়ে তাদের স্বাগত জানালেন। ছোট নাতীটিকে আদরে আহ্লাদে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রফিককে দাদার সঙ্গে আনন্দে খেলা করতে দেখে মা একটু হাসলেন তিনি বুঝতে পারছিলেন যে এটা আল্লাহ্ তাআলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ তার প্রতি যে, তার মৃত্যুর সময়কে কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। দশদিন পার হওয়ার পরই রফিক হঠাৎ করে পূর্বের মত রক্ত বমিতে আক্রান্ত হলো।

আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। মা এই শোক খুবই ধৈর্য্যের সঙ্গে মোকাবেলা করলেন আর আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যে দৃঢ় রইলেন, কেননা তিনি সর্বান্তকরনেই এটা জানতেন যে তার আকুল দোয়ার ফলেই আল্লাহ্ তাআলা তার বাচ্চার আয়ু ক'দিন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এই দু'টি মর্মস্পর্শী হৃদয় বিদারক ঘটনা ও তার পরবর্তী ফল এই বই এর উর্দু সংস্করণের (প্রথমে প্রকাশিত) পাঠকদের বিব্রত ও হতবুদ্ধি করে দিয়েছিলো ফলে এর একটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যা এখন আমি করার চেষ্টা করছি। মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় সত্য এই যে, শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা মানুষ ও সব কিছুর জীবন মৃত্যু ও তার স্থায়ীত্ব ও বিনাশের মালিক যা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে, **'আল্লাহই জীবন মৃত্যু দেন'** (৩ ঃ ১৫৭) **আল্লাহর আদেশ ছাড়া কেহই মরে না** (৩ : ১৪৬)। হুসেন বিবির (মা এর) বিশ্বাস এই দৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার থেকে সামান্য বিচ্যুতি তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাসের পরীক্ষাও কখনো কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়ে থাকে, যাতে ধৈর্য্যশীলতা বাড়ে। কষ্ট ও নিপিড়নের মধ্যে থেকে বিশ্বাসের নিখাদ সোনা উজ্জল্য নিয়ে বেরিয়ে আসে, যেন বিশ্বাসের উচ্চারণ শুধুমাত্র মৌখিক বাক্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পরীক্ষা করবো ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, সম্পদের ও জীবনের ক্ষতি দিয়ে, তারপর সুসংবাদ দাও তাদের যারা ধৈর্য্যশীল যখন তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব। এদের উপরই তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আশীষ ও কল্যাণ, এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত [আল-কোরআন (২ঃ১৫৬-১৫৮)]।

মা'র পরীক্ষা হয়েছে বার বার, কিন্তু তিনি হারেন নি বা ফেল করেননি বরং আরো ধৈর্য্যশীল ও দৃঢ়চিত্ত হয়েছেন, আল্লাহর অনুকম্পা তার প্রমাণও দিয়েছে। এই মর্মস্পর্শী মানবিক ঘটনার দু'একটি খুটিনাটি ব্যাপারে ভাল করে বোঝার অবকাশ আছে। এই ঘটনার মধ্যে জয়দেবীর অনুপ্রবেশ নিতান্তই দৈবাৎ ব্যাপার। এটা সত্য যে জয় দেবীর ব্যক্তিগত আবির্ভাব ও কাজী জাফর, রফিকের জীবনের প্রতি এ একটি হুমকী হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে বিশেষত রফিকের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটি এসে ছিল স্বপ্নের মাধ্যমে, জয় দেবীর ব্যক্তিগত সাক্ষাতে নয়।

এই বাড়ীতে আসতে জয়দেবীকে কখনো নিষেধ করা হয়নি এবং মা যখনই দাতা জাইদকা যেতো জয়দেবীও প্রায়ই আসতো। কিন্তু কখনো তার জ্যোতিষী ধরনের কোন কান্ডের কথা শোনা যায় নি।

মা'র স্বপ্নের ব্যাপারে এটা বলা যায় যে, কোন মানুষই নিজের ইচ্ছানুসারে (পরিকল্পনার দ্বারা) নিজেকে অন্যের স্বপ্নের মধ্যে আবির্ভূত করতে পারে না। কাজেই জয়দেবীও নিজেকে মায়ের স্বপ্নের ভেতরে নিয়ে আসতে পারে নাই। কিন্তু তাতে তো এই কুহেলিকার জট ছাড়ছে না। আসল ঘটনা হচ্ছে, স্বপ্নে জয়দেবীর আবির্ভাব একটি 'কুলক্ষণ' ছিল। মনে হয় মা'র এমন একটি অসুখ ছিল যাকে দেশীয় 'দাইরা' 'আথরা' বলে। এর ফলেই মা'র সন্তান শিশু অবস্থায়ই মারা যায়। যে অদ্ভূত দৈব যোগাযোগ ঘটেছিল জাফরের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তার উপর জয়দেবীর চোখ পড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এবং এর ফলে মার মনের উপর যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, তাই রফিকের ক্ষেত্রে 'আথরা'র উপসর্গের আগমনে মায়ের মনের উপর জয়দেবীর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

রফিকের আক্রান্ত হওয়ার সময়ও সেই অনুক্ষণে জয়দেবীকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, যে তাকে বলছিলো রফিককে জীবিত নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারবে না। এর মানে এই ছিল যে রফিকও সেই 'আথরা'য় আক্রান্ত হতে যাচ্ছে এবং হয়েও ছিল তাই। তাতে তার মৃত্যুও ঘটতো কয়েক ঘন্টার মধ্যেই। কিন্তু সর্বশক্তিমান ও চিরঞ্জীব জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ তাআলা তার আকুল প্রার্থনা কবুল করেছিলেন ও রফিকের সময় কিছু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই সে সুস্থ ও হাসি-খুশী অবস্থায় ঘরে পৌছতে পেরেছিলো। এটাই তার জ্বলন্ত প্রমান যে একমাত্র আল্লাহই জীবন দেন এবং মৃত্যুর কারণও তিনি। জয়দেবী কারও কোন কিছু করতে সমর্থ ছিলো না। যখন রফিকের নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা পার হয়ে গিয়েছিল তখন তার মৃত্যু হয়েছিল। তাতে জয়দেবীর কোন হাত ছিল না।

এর কিছু দিন পর মা আবার জয়দেবীকে স্বপ্নে দেখলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি কবে আমার পিছু ছাড়বে'? জয়দেবী তাকে বলল, 'আমি তের দিন ও সতের দিনের মাথায় আবার আসবো। তারপর আর আসবো না'। তখন আমার বাবা দাস্‌কায় মুখ্‌তার হিসাবে ব্যবসা করছিলেন। ঠিক তের দিনের মাথায় মা এক কন্যার জন্ম দিল। আর সতের দিনের মাথায় মেয়েটি মারা গেলো। জয়দেবীর এই আশ্বাস যে, এর পর আর সে আসবে না, এতে বোঝা গেলো যে, এই সন্তান হারা মা'র এক দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত অসুস্থতা এই কন্যা সন্তান প্রসব ও তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আল্লাহর কৃপায় দূর হয়ে গেল। তার পর তিনি যে সন্তান লাভ করবেন তার মধ্যে এই অসুস্থতা আর থাকবে না।

প্রায় সেই সময়ই বাবা পূর্ণ উকিল হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করলেন ও শিয়ালকোট গিয়ে সেখানকার জেলা আদালতে আইনজীবি হলেন। আমার মা হুসেন বিবির এখন নিজের একটি বাসা হলো, যদিও তা তিনি চালাতেন খুব সাদাসিধা ভাবে। কৃচ্ছতার দিন শেষ হয়েছিল। কিন্তু জয়দেবীর পালা তখনও শেষ হয়নি। আবার কোন এক সময় 'মা' এর স্বপ্নে তার আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু সে এ বাড়ীতে পা রেখেই আর্তনাদ করে উঠেছিল, 'রাম রাম রাম এ বাড়ীতে গো মাতার' অসম্মান হয়েছে। এখানে আর আমি আসবো না'। এই বলে সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ছেড়ে পালালো। মা তো খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। আসলে ঘটনা ছিল এই রকম যে, যদিও পাঞ্জাব অঞ্চলের মুসলমান পরিবারগুলো বেশ কয়েক পুরুষ ধরেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিল, তথাপি যেহেতু তারা হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তাই তাদের মধ্যে কিছু কিছু হিন্দুয়ানী রীতিনীতিরও প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে একটা ছিল গরুর মাংস ভক্ষণে তাদের অনীহা। জয়দেবীর ঐ আর্তনাদের অর্থ ছিল যে এ বাড়ীতে গোমাংস খাওয়া হয়েছে। তারপর যথারীতি অনুসন্ধান করা হলো। দেখা গেল গত রাতে যে সকল মেহমান এসেছিল তাদেরকে নিজেদের জন্য বাড়ীতে যা কিছু রান্না হয়েছিল তাই দিয়ে রাতে আপ্যায়ন করা হয়েছিল। তাই নিজেদের খাওয়ার জন্য কাজের ছেলেটিকে দোকান থেকে রান্না করা খাবার কিনে আনার জন্য পাঠানো হয়। তখন বেশ রাত হয়ে পড়েছে। কাজেই যে দোকানে গরুর মাংস (রান্না করা) বিক্রী হয় সেই দোকান ছাড়া অন্য দোকানে কিছু পাওয়া গেল না বলেই ছেলেটি তা থেকেই খাবার কিনে নিয়ে আসলো। বাড়ীর সবাই তা দিয়ে তাদের রাতের খাবারের পাট চুকালো। কেউ বুঝতেও পারেনি যে তারা গরুর মাংস ভক্ষণ করেছে। এর পর থেকে মা এর স্বপ্নের ফলে ঐ বাড়ীতে পরিবারের প্রধানের অজ্ঞাতে মাসে দু'একবার গরুর মাংস রান্না হতো।

আমার মনে হয় মা'র বিশেষ ধরনে অসুস্থতা ঐ গরুর মাংস খাওয়ার ফলেই আরোগ্য হয়েছিল। এটা অবশ্য আমার অনুমান মাত্র।

মা'র চতুর্থ সন্তান প্রসবের সময়ও প্রায় ঘনিয়ে আসছিলো। পরিবারে তখন মাসে দু'দিন করে গরুর মাংস ভক্ষণ করা হচ্ছে। তবু এক দিন মা'র স্বপ্নে জয়দেবীর আবির্ভাব হলো, 'সে বলল যে পরবর্তী সন্ধ্যায় তার এক পুত্র সন্তান হবে এবং ঐ সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য কিছু সতর্কতা নেওয়া দরকার। তা হলো জন্মের পরই তার ডান নাক সুঁই দিয়ে ছিদ্র করে তাতে উটের রশি গিঠ দিয়ে রাখতে হবে। আর একটি পাত্রে ময়দা, হলদি গুড়া ও মাখন দিয়ে তাতে সলিতা দিয়ে ঘরের চালের চূড়ায় স্থাপন করে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্ঘ্যের সলিতা জ্বালিয়ে দিতে হবে। আমার মা হুসেন বিবি এই স্বপ্নের কথা বাবাকে বললেন। স্বপ্নে যে সময়ের কথা বলা হয়েছিল ঠিক সেই সময়েই আমার জন্ম হয়। সেটা ছিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ই ফেব্রুয়ারী। আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মা যখন সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি দেখলেন তার মাথার কাছে টেবিলে কিছু জিনিষপত্র এনে রাখা হয়েছে। বাবার চাচাত বোন মাকে সেবা শুশ্রুষা করছিলেন। মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'ঐ গুলি কি?' তিনি বললেন, স্বপ্নে তাকে যা বলা হয়েছিল ঐ গুলি তাই। মা খুব প্রতিবাদ করলেন, বললেন ঐ সব না-জায়েজ কাজের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই। ফুফু বললেন, কিন্তু তোমার স্বামীতো মনে করে এতে কোন ক্ষতি নেই। মা বললেন, অবশ্যই ক্ষতি আছে। এগুলো সবই কুসংস্কার। শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলাই জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তিনি যদি এই ক্ষুদ্র মানব দেহে জীবন দিতে চান এটা বেচে থাকবে। আর তিনি যদি এটার জীবন তুলে নিতে চান তাহলে তার যাওয়াই শ্রেয়। এইরূপ কুসংস্কার ও কু-বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি আমার একিনের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারবো না' এই বলে মা তার দূর্বল হাত দিয়ে গামলাটিকে দূরে ছুড়ে ফেললেন। এটাই মায়ের সাথে জয়দেবীর শেষ মোকাবেলা।

এই বিচ্ছিরী মহিলা তার কষ্টকর জীবন বয়ে বেড়িয়েছিল আরো অনেক দিন। প্রত্যেকেই তাকে ত্যাগ করেছিল। যখন সে বার্ধ্যক্যে পৌছে গিয়েছিলো তাকে দেখাশুনার কেউ ছিল না। খাওয়া জোগাড় করার মত অবস্থাও তার ছিল না। এমনকি তাকে পানিও দেওয়া হতো না। শেষ পর্যন্ত নিজের বিছানায় চাদরের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সে নিজেকে পুড়িয়ে মেরেছিল।

অনুচ্ছেদ- ৩

নৈতিক শিক্ষা

আমার দাদা চৌধুরী সিকান্দার খান অত্যন্ত ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তার জীবনও ছিল অত্যন্ত পূণ্যময়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মক্কায় হজ্জব্রত পালন করেন এবং মদীনাও সফর করেন। তিনি তার হজ্জের এবং ঐ সফরের ধারাবাহিক বিবরণী লিখে ছিলেন। তা থেকে জানা যায় যে দাদা ও তার সহযাত্রীরা জেদ্দা থেকে মদীনা যাওয়ার জন্য সমুদ্র পথে ইয়ানবু পর্যন্ত গিয়েছিলেন, তারপর স্থলপথে মদীনা পর্যন্ত। ফেরৎ যাত্রাও ছিল একই ভাবে। ফিরে এসে তিনি মাকে বলেছিলেন যে তিনি যেখানে যখনই গিয়েছেন প্রত্যেক সুযোগে তার নাতীর (আমার) জন্য দোওয়া করেছেন। তখনকার দিনে হজ্জ করা যে শুধুমাত্র দৈহিক ভাবেই খুব কষ্টকর ব্যাপার ছিল তা নয়, তাতে স্বাস্থ্য ও জীবনের ঝুকিও ছিল যথেষ্ট। তখন আমাশয়ে অনেক লোক মারা যেতো। আমার দাদার সহযাত্রীদের মধ্যে একজন বোম্বাইতে ফেরার পথেই আমাশয়ে আক্রান্ত হয়েছিল এবং বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। অন্য একজন বাড়ী ফিরে আক্রান্ত হন ও কিছুদিনের মধ্যেই মারা যান। কিন্তু আমার দাদা কিছুদিন বেশ ভালই ছিলেন, তারপর কয়েক মাস পরে তিনিও আক্রান্ত হন। কয়েক দিনের মধ্যেই তার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। তাতে বাবা খুব ঘাবড়ে যান ও প্রতিদিন বাড়ীতে যাওয়া শুরু করেন। শিয়ালকোট থেকে দাস্‌কা পর্যন্ত ষোল মাইল পথ ইট বিছানো ছিল না। বাবা প্রতি দিন কোর্টের পর পরই ঘোড়ায় চড়ে চলে যেতেন, আবার সকালে সরাসরি দাস্‌কা থেকে রওয়ানা হয়ে এসে কোর্ট করতেন।

তখন ছিল ফেব্রুয়ারী মাস। এতো ভোরে কন্‌-কনে শীতের মধ্যে দাস্‌কা থেকে শিয়ালকোট আশা ছিল খুবই কষ্টকর ব্যাপার। দাদার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকলো। বাবা তখন সর্বক্ষণ তার সঙ্গেই থাকতেন।

যখন টেলিগ্রাম মারফৎ দাদার মৃত্যুর খবর আসলো মা তখন তার তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে শিয়ালকোট থেকে দাস্‌কা চলে এলেন। তার শ্বশুর সব সময়ই তার প্রতি সদয় ও স্নেহশীল ছিলেন। তাই তার মৃত্যু মার মনটাকে ভেঙ্গে দিয়ে গেল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাংখীরা দলে দলে জামায়েত হতে লাগল। জানাজায় এক বিরাট জনতার সমাবেশ হয়েছিল।

দাদা নিজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী রীতি-নীতির কঠোর বিরোধী ছিলেন, যেমন মৃতের জন্য কান্না-কাটি বা উচ্চস্বরে শোক প্রকাশ করার যে চল গ্রামের মুসলমানদের

মধ্যে ছিল, দাদা তার বিরোধীতা করতেন। কিন্তু এখন তার মৃত্যুর পর যখন বিরোধীতার কেউ রইল না তখন পরিবারের মেয়েরা এমন কি আমার মা শুদ্ধ ঐ রকম কান্নাকাটিতে শরীক হয়ে পড়ল। মৃত্যুর মাঝে ধৈর্য্য, অবিচলতা, গাম্ভীয্য ও মহত্ত্ব দেখাবার কথা, অথচ সামাজিক আচার প্রথার কাছে তার জলাঞ্জলি ঘটল।

কয়েক দিনের মধ্যেই মা দাদাকে স্বপ্নে দেখলেন। দাদা তাকে নিয়ে যেন কোথাও যাচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী দেখাবার জন্য যাচ্ছিলেন। তিনি প্রথমে তাকে একটি দৃশ্য দেখালেন যেন নরকের দৃশ্য, যাতে কিছু মহিলার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে। দাদা তাকে জানালেন যে এক মৃতের জন্য বিলাপের জন্যই তাদের এই শাস্তি। দাদা তাকে আরো বললেন যে, তাদের এই অবস্থা থেকে মা'র শিক্ষা গ্রহণ করা উচৎ এবং এই কাজ পরিহার করা উচিৎ। তারপর তিনি তাকে নিয়ে আরেক জায়গায় গেলেন। সেখানে তাকে রসূল (সাঃ)-এর কবর ও বিবি ফাতেমা (রাঃ)-এর কবর দেখালেন। কবর দু'টো যেন এক সুন্দর বাগানের মধ্যে ছিল, আর তাদের মাথার দিক দিয়ে দু'টি পরিষ্কার টলটলে পানির ফোয়ারা বইছে। মা সেখানে বসে মুখ, হাত ধুয়ে ওজু করলেন, যেন নামাজ পড়ে তওবা করবেন। তারপর তিনি সেখানে নিজের ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন।

কিন্তু যত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি তওবা করেছিলেন তা তিনি পুরোপুরি পালন করতে পারেননি। কিছুদিন পর এক নিকটাত্মীয় মারা গেল। মা যদিও খুবই সংযত থাকলেন এবং সমবেত বিলাপে অংশ নেওয়া থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখলেন, তথাপি অন্যান্য সব আত্মীয়দের চাপে পড়ে কিছু কিছু কু'প্রথায় অংশ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর পর তিনি পরপর বেশ কটি স্বপ্ন দেখলেন। একটিতে তিনি দেখলেন, এক পাল পিপড়া তার শরীর বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছে, আর তিনি বার বার ঐ গুলিকে ঝেড়ে ফেলার জন্য প্রানান্ত চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। তিনি যদি কয়েকটিকে ঝেড়ে ফেলেন তো আরো কিছু তার শরীর বেয়ে উঠে আসে। এর মাঝে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু আবার ঘুমাতে গেলে তিনি একই দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেন। এভাবে বার বার হতে থাকে। তার নিদ্রা হারাম হয়ে যায়। মা বুঝতে পারলেন তওবা ভঙ্গ করার শাস্তি স্বরূপ এইরূপ হচ্ছে। মা আবার সেজদায় পড়ে গেলেন। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন, আর এর পর থেকে এ সকল বেদাতী কু-প্রথায় অংশ না নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি আবার দাদাকে স্বপ্নে দেখলেন। দাদা তাকে প্রথমেই তওবা ভঙ্গ করার জন্য বকা-ঝকা করলেন। তারপর তার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকতে উপদেশ দিলেন। তিনি তাকে পরিষ্কার একটি কাপড় দিয়ে

বললেন এই কাপড়টাকে পরদা হিসাবে ব্যবহার করে পুকুরের পরিষ্কার পানি দিয়ে নিজেকে ধুয়ে নিতে। মা পানিতে নেমে গেলেন। যতই তিনি পানিতে নামছেন ততই পিপড়া গুলি দূর হয়ে যাচ্ছে। পিপড়াগুলো অস্পূর্ণভাবে দূর না হওয়া পর্যন্ত তিনি পানিতে নামলেন। তিনি খুবই স্বস্তি ও আরাম বোধ করলেন। তৎক্ষণাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি মহান আল্লাহর কাছে স্বকৃতজ্ঞ শুকরিয়া আদায় করলেন, আর কখনো ভুল করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। কিন্তু আবার তিনি পরীক্ষায় নিপতিত হলেন। আমার ছোট চাচার বড় ছেলে মারা গেলো। মা বিলাপ গাঁথাতে অংশ গ্রহণ করা থেকে পুরোপুরি আলাদা থাকতে ব্যর্থ হলেন। এবার তিনি স্বপ্নে দেখলেন দু'টো ভীষণ দর্শন লম্বা সিংওয়ালা ষাড় তাকে তাড়া করছে এফোর ওফোর করার জন্য। তিনি আশ্রয়ের জন্য দৌড়াচ্ছেন। কিন্তু ঐ গুলি তাকে ধরে ফেলছে এবং আঘাত করে আহত করে দিচ্ছে। আবার মা'র রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল। এখন তার রাত কাটে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনায়, কাতর দোয়ায়। তার এই করুন অবস্থা দেখে বাবার হৃদয়ে দয়া হলো। তিনিও মা'র জন্য রাত জেগে দোয়া করতে থাকলেন। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হলো না। পুরো এক মাস মা নির্যাতন ভোগ করলেন। তারপর একদিন আবার দাদাকে স্বপ্নে দেখলেন। দাদা তাকে খুব বকা-ঝকা করলেন এবং বললেন এটাই তার অনুশোচনা করার শেষ সুযোগ। এর পর আর কোন বিচ্যুতি ক্ষমার অযোগ্য বলে ধরা হবে। এরপর স্বপ্নে দাদা ষাঁড় দুটোকে টেনে ধরে থাকলেন। মা বিনা বাঁধায় চলে আসার পথ পেলেন।

আমার সবচেয়ে বড় ফুফুর বড় ছেলের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমার মা আবার পরীক্ষায় পড়েছিলেন। আমার এই সুন্দর টগবগে তরুন ফুফাত ভাই-এর মৃত্যুতে মা শোক জানাতে ফুফুর বাড়ী গিয়েছিলেন। গ্রামে এটা প্রচলিত রীতি ছিল যে, যখন মৃতের আত্মীয় মহিলারা বিলাপ গাঁথা গাইতে গাইতে পথ দিয়ে আসতো তখন পাড়ার মানুষ ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তাদের দেখতো। এই বার মা কিন্তু অন্যান্য মহিলা যাদের সঙ্গে ফুফুর বাড়ী যাচ্ছিলেন তাদের চুপ করে থাকতে ও শোকের কোন প্রকাশ না দেখাতে বললেন। গ্রামের পথ দিয়ে কোন ধরণের বিলাপ ও শোকগাঁথা ছাড়াই তাদের এই নীরব ও গাম্ভীর্যপূর্ণ আগমন গ্রামের লোকদের হতাশ করে দিল। তাদের মধ্যে একজন তো বলেই উঠল, 'মা বোনেরা আপনরা বরং হাসতে হাসতেই এগিয়ে যান'। ঐ সব টিটকারী সহ্য করেও মা ও তার সহযাত্রীরা নীরবে শোকবহন করে ফুফুর শোকাচ্ছন্ন বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। সেখানেও সবাই প্রচলিত কু-প্রথা বর্জন করে নীরবে শোক বইছিলেন এবং কেউ বিলাপ করছিলেন না। ঐ ধরনে প্রচলিত বিলাপ ও উচ্চস্বরে শোক

প্রকাশের প্রথা অবশ্য পরে এই এলাকা থেকে পুরোপুরি নির্মূল হয়ে গিয়েছিল এক প্রলয়ঙ্কর প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের মাধ্যমে। ঊনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিকের ঐ প্লেগে গ্রাম ও শহরগুলি বিরান হয়ে গিয়েছিল। কয়েক বৎসর ঐ প্লেগের প্রকোপ ছিল।

মা অবশ্য স্বপ্নে দাদার মাধ্যমে এভাবে প্রায়ই তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণে উন্নতি করছিলেন। ১৯০৩ সনে মা একবার স্বপ্নে দাদাকে তার কাছে রক্ষিত একটি অচল এক টাকার মুদ্রা বদলে দিতে অনুরোধ করেন। দাদা অচল মুদ্রাটা হাতে নিয়ে মাকে অন্য একটা মুদ্রা দিলেন, আর বললেন, 'এই একটাই মাত্র আমার কাছে ছিল। এটা যত্ন করে রেখো, কেননা এটাতে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'** নামাঙ্কিত আছে। ঐ স্বপ্নের দ্বারা মা বুঝতে পারলেন তার আর একটি ছেলে হবে। কিন্তু তার তৃতীয় ছেলে, হামদুল্লাহ খান, যে বেশ দূর্বল ও অসুস্থ ছিল, সে মারা যাবে। এরকমই ঘটেছিল। কয়েক মাস পরে আসাদুল্লাহ্ খান জন্মগ্রহণ করে এবং কিছু দিনের মধ্যেই হামদুল্লাহ্ খান হামে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। মা ও বাবা এই শোক অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্তে বহন করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ- ৪

আধ্যাত্মিক স্বর্গ

মৌলভী মোবারক আলী সাহেব ছিলেন শিয়ালকোট সেনানিবাসের জামে মসজিদের তৎকালীন মোতায়াল্লী ও ইমাম (এই মৌলভী সাহেবের পিতা মৌলভী ফজল আহমদ ছিলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ও কবি ইকবালের বাল্যকালের শিক্ষক)। এই জামে মসজিদ সংলগ্ন প্রচুর পরিমান আবাদী জমি ছিল, যার আয় দিয়ে মোতায়াল্লী নিজের ও মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ খুব সন্দর ও সুচারুরূপে করতেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে উনিশ শতকের একদম শেষ দিকে এই মৌলভী মোবারক আলী আহমদীয়া আন্দোলনে যোগদান করেন। তা কিছু কিছু মতবাদ গোঁড়া মৌলভী সাহেবদের মনপূতঃ ছিল না। ফলে তার বিরুদ্ধে মুসল্লীদের ক্ষিপ্ত করা হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একদল মুসল্লীর দ্বারা কোর্টে মামলা ঠুকে দেওয়া হলো যে আহমদীয়া আন্দোলনে যোগদানের ফলে মৌলভী মোবারক আলী ইসলাম ধর্মচ্যুত হয়েছে। কাজেই জামে মসজিদের ইমাম ও মোতায়াল্লী থাকার তার আর কোন যোগ্যতা বা অধিকার নেই। শিয়ালকোর্টে তখন কোন আহমদী উকিল ছিল না। কাজেই তারা আমার বাবাকে তাদের পক্ষের উকিল নিযুক্ত করল। বাবা এই কেস নিয়ে আহমদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করতে বাধ্য হলেন। কেননা মৌলভী মোবারক আলীর বিরুদ্ধবাদীরা তার ইসলাম থেকে বিচ্যুতির যে অভিযোগ তুলে ছিলেন তার জবাব দেওয়ার জন্য ইসলামী শরীয়ত, নীতিমালা ও মৌল বিষয়াদী এবং আহমদীদের মতামত সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। এই তুলনামূলক পড়াশুনা করতে গিয়ে বাবা ধীরে ধীরে আহমদীয়া আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ছিলেন।

অন্য একটি ব্যাপার যেটা তাকে খুব মোহিত করেছিল তা ছিলো এই যে, যখনই বিরুদ্ধবাদীরা বা তাদের স্বাক্ষীরা হলপ নেওয়ার পর জবানবন্দী, স্বাক্ষ্য বা জেরার উত্তর দিতো তারা মিথ্যা বলতে বা তাদের আগের কথাকে নাকচ করতে বা পেচিয়ে পেচিয়ে কথা বলতে দ্বিধা করত না। অথচ আহমদী বিবাদী বা তার স্বাক্ষীরা মামলার ফলাফল কি হবে না হবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সব সময় সত্য ও সোজা উত্তর দিত। বাবা ভাবতে শুরু করলেন যে তারা সত্য পথে আছে, তাদের ঐ উচ্চ নৈতিক আদর্শই তার প্রমাণ। শেষ পর্যন্ত ঐ মামলায় বিচারকরা মৌলভী মোবারক আলীর বিরুদ্ধে মামলার কোন যৌক্তিকতা না পেয়ে মামলাটি

খারিজ করে দেন। বাদীরা ট্রায়াল জজের এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করেন। সেখানেও তা বাতিল হয়ে যায়। এই মামলার ফলাফল এই হলো যে, বাবা এই ইসলামী আন্দোলনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন।

কিছুদিন পর বাবাকে আহমদীদের আর একটি মামলায় সাহায্য করার জন্য ডাকা হয়। মামলাটি ছিল গুরুদাসপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্বয়ং আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদের বিরুদ্ধে। তিনি নাকি তার বিরুদ্ধবাদী এক মৌলভী সাহেবের (মৌঃ করমুদ্দীনের) সম্বন্ধে মান হানীকর কথা বলেছেন। তাই ঐ মৌলভী সাহেব ফৌজদারী মামলা ঠুকে দিয়েছেন। এই উপলক্ষে বাবাকে গুরুদাসপুর যেতে হয় এবং তিনি ঐ জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্বয়ং এর প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিগত সাহায্য লাভ করেন। তিনি তাঁর অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক মোকামের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন। এর পর থেকে তিনি এই জামাআত সম্বন্ধে ভালভাবে পড়াশুনা করতে শূরু করেন, জামাআতের পত্রিকা আল-হাকামের নিয়মিত গ্রাহক হন ও মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর বিশেষ স্নেহভাজন শিষ্য মৌলভী আব্দুল করীম (রাঃ)-এর কুরআন ক্লাস ও দারসে নিয়মিত উপস্থিত হতে লাগলেন। বাবা কখনো এই জামাআতের বিরোধীতা করেন নাই। কিন্তু তার মন মানসিকতা ছিল যুক্তিবাদী। তাই তিনি অত্যন্ত ভাবনাচিন্তা ও বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত নিতেন।

ঠিক ঐ সময়ে আমার নানা ও মামা এই জামাআতে যোগ দেন। কিন্তু এ ব্যাপারে মা'র প্রায় কোন ধারনাই ছিল না। সে বৎসর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে 'মা' পর পর কিছু স্বপ্ন দেখেন, যা দেখে তিনি অভিভূত হয়ে যান। ঐ স্বপ্ন গুলোর কয়েকটা এখানে বর্ণনার প্রয়োজন রয়েছে।

একবার তিনি স্বপ্নে দেখলেন, রাস্তার লোকজন খুব তাড়া হুড়া করে চলছে। সবাই তাদের সুন্দর সুন্দর পোষাকাদী পরে একই দিকে যাচ্ছে। মা ভাবলেন তারা কোন বিশেষ মহতি অনুষ্ঠান দেখতে যাচ্ছে। তিনি বাবাকে বললেন, চলুন আমরাও আমাদের গাড়ী নিয়ে যাই। বাবা রাজী হলেন। তারা রওনা হলে পথে বাবার বন্ধু উকিল চৌধুরী মোহাম্মদ আমীন তার বাসা থেকে বাবাকে ডাক দিলেন। বাবা তার সঙ্গে কথা বলার জন্য গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। মা যেন একাই এক বিরাট মাঠের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে আরো লোকজন জমায়েত হচ্ছিল। বিরাট এক জনতা সেখানে জমা হয়ে গেল। অনেকে গাছে উঠতে শুরু করল। ঐ জনতার মাঝখানে কিছুটা জায়গা ফাঁকা ছিল। ঐ ফাঁকা জায়গায় একটি ঢাকা দেওয়া দোলনা ঝুলছিল দোলনার দড়িগুলো যেন আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মা অনুভব করলেন, দোলনায় যেন কেউ বসে আছে।

কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। ঐ মাঠের এক দিকে গ্যালারীর মত দেখা যাচ্ছিল, তার মধ্যে মাত্র দু'টি আসন খালি ছিল। মা সেখানে গিয়ে একটি আসনে বসলেন, আর অন্য আসন বাবার জন্য দখল করে রাখলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন বাবা কিছুক্ষণ পর এসে উপস্থিত হবেন। তখন দোলনাটি পূর্ব-পশ্চিমে দূলতে শুরু করলো এবং এর ভিতর থেকে আলো বিচ্ছূরিত হতে থাকলো। যতই দোলনাটি জোরে জোরে দুলতে লাগলো ততই তা থেকে উজ্জ্বলতর আলো ঠিক্‌রে বেরুতে শুরু করলো। দোলনাটি যে দিকে যাচ্ছিল সেদিকের লোকজন আনন্দে চিৎকার করে উঠছিল 'স্বাগতম হে আল্লাহর নবী' স্বাগতম হে আল্লাহ্‌র নবী। দোলনাটি দুলতে দুলতে যেন শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রান্তসীমা ছাড়িয়ে গেল। এই স্বপ্ন ছিল মায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক সংবাদবহ অভিজ্ঞতা। এই স্বপ্নের খুটিনাটি ব্যাপারগুলির পূর্ণতা পরবর্তীকালে প্রতিভাত হয়েছিল।

এর কিছুকাল পর মা আর একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন যে, খুব ভোর বেলায় যেন তিনি মক্কায় হজ্জ করার জন্য রওনা হচ্ছেন। তিনি অনুভব করলেন যে, তিনি এক্কা গাড়ীতে (মেঠো পথে চলার উপযোগী এক ঘোড়ায় টানা স্প্রিং ছাড়া গাড়ী যা তখন বেশ প্রচলিত ছিল) ভ্রমণ করছেন। প্রায় মধ্যাহ্নের সময় এক্কার চালক এক বট গাছের কাছে গাড়ী থামালো। মা তাকে বললেন, তিনি তো মক্কা যেতে চেয়েছিলেন। তাতে চালক বললো এটাই তো মক্কা। মা অবাক হয়ে দেখলেন যে মাত্র ১২ ঘন্টার পথ তিনি চলেছেন। গাড়ী থেকে নেমে তিনি পথ চলতে শুরু করলেন। সদর রাস্তা থেকে এক গলি পথে ঢুকে এক বাড়ীতে প্রবেশ করে তিনি তার দোতলায় উঠে গেলেন। সেখানে তিনি একটা কাঠের র‍্যাক দেখলেন, যার উপর একটা বড় রেজিষ্টার বই ও একটা কাঠের বাক্স রাখা আছে। বাক্সটার মুখের দিকে একটু খোলা। মা বাক্সটার খোলা জায়গায় হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে বিনীত ভাবে এই দোয়া করলেন, 'আল্লাহ্‌ তুমি আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করে দাও'।

তিনি তিনবার এই দোয়া করলেন। তারপর তিনি বললেন, 'তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে?' তাতে মা স্পষ্ট ও দৃঢ় এক উত্তর শুনলেন, 'আমি সবচেয়ে ক্ষমাশীল। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করবো, তবে তোমার নাম যদি ঐ রেজিস্টারে উঠে থাকে। স্বপ্নেই মা বললেন যে, ঐ রেজিস্টারে মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ইত্যাদি লেখা হয়। তখন তিনি চিন্তা করছিলেন, তাদের গ্রামের চৌকিদার তার (মা'র) ব্যাপারটি ঠিক মত এই বই-এ রেকর্ড করেছিল কি না।

অল্প দিন পরই মা বাপের বাড়ী দাতা জাইদ্‌কা যান, সেখানে নানাকে তিনি তার স্বপ্নের বিষয় খুলে বললে, নানা তাকে বলেন যে, স্বপ্নে তার নির্দিষ্ট স্থানটি ছিল

কাদীয়ান (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যেখানে ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন) এবং মা'র উচিৎ এই আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। এতে মা নানাকে বললেন, ঐ ব্যক্তি (মির্যা সাহেব) যদি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা স্বপ্নে আমাকে তাঁর দর্শন দিবেন এবং তাঁর সত্যতা আমার কাছে তুলে ধরবেন।

এর পর তিনি আবার একটি স্বপ্ন দেখেন। দেখেন এক সন্ধ্যায় তিনি বাড়ীতে অনেক অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি দেখেন পশ্চিম দিকের একটি ঘর থেকে উজ্জ্বল আলো আসছে। মা অবাক হয়ে গেলেন, মনে করতে পারলেন না আদৌ ঐ ঘরে তিনি কোন প্রদীপ দিয়েছিলেন কি না। ঘরের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, জ্যোতির্ময় হয়ে আছে সারা ঘর, জ্যোতির্ময় চেহারার এক বুজুর্গ ব্যক্তি সোফায় বসে নোট বইয়ে কিছু লিখছেন। মা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাঁর পিছন দিকে এগিয়ে গেলেন, যেন তাঁর কাজে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। কিন্তু তিনি যেন বুঝতে পারলেন ঘরে কেউ এসেছে, তাই ঘর ছেড়ে যাওয়ার জন্য সোফার উপর নড়ে উঠলেন। মা তাড়া-তাড়ি বলে উঠলেন যে তার মহৎ উপস্থিতিতে মা অনির্বচনীয় আনন্দ পাচ্ছে, তাই তিনি যেন দয়া করে আরো কিছুক্ষণ এখানে অবস্থান করেন। তিনি একটু দেরী করলেন, তারপর যখন উঠে যেতে চাইলেন মা তখন সাহসে ভর করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জনাব কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, যে বুজূর্গ ব্যক্তিকে তুমি দেখেছিলে তিনি কে, তখন আমি কি জবাব দেব? ঐ বুজূর্গ তখন তার ডান দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকালেন। তারপর ডান হাত তুলে বললেন, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তখন বলবেন আপনি আহমদকে দেখেছেন'। মা যখন এই স্বপ্ন বাবাকে বললেন, তখন বাবা বলল, 'রসূল (সা:)-এর এক নাম তো আহমদ। তুমি হয় তো তার দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছ'। কিন্তু মা বললেন, তার সে রকম অনুভূতি হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এখানকার কোন বুজুর্গ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, যাঁর দ্বারা তিনি সত্য পথে পরিচালিত হবেন বলে আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন। আমার মামা এই স্বপ্ন শুনে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই মির্যা সাহেবকেই দেখেছ (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ:) প্রতিশ্রুত মসীহ মাহদী হওয়ার দাবীদার)। মা বললেন, 'কিন্তু তিনি তো নিজেকে মির্যা সাহেব বলেন নি, তিনি তো বলেছেন আহমদ'। মামা বললেন, 'মির্যা সাহেবের নামতো গোলাম আহমদ। তুমি সত্য পথেই আছ বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং তুমি দোওয়া করতে থাক। তোমার কাছে অবশ্যই পূর্ণ সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠবে'।

এর কিছুদিন পর শোনা গেলো যে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টম্বরে লাহোরে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবীদার মির্যা গোলাম আহমদের একটি বক্তৃতা তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর শিষ্য মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব প্রকাশ্য জনসভায় পড়ে শুনাবেন। বাবা ঐ বক্তৃতা শুনতে লাহোর গেলেন এবং সৌভাগ্য ক্রমে তিনি আমাকেও নিয়ে গেলেন। সেই পবিত্র চেহারার উপর আমার চোখ পড়ার পরেই আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকলাম। যতক্ষণ বক্তৃতা পড়ে শূনানো হচ্ছিল আমি সেই উজ্জ্বল চেহারার উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারিনি। সারাক্ষণ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার হৃদয় ও মস্তিস্ক তার সত্যতার বানে বিমুগ্ধ হয়ে গেল এবং আমি সম্পূর্ণ তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে গেলাম। আমি তখন স্কুলের ছাত্র, মাত্র ১২ বৎসর বয়স তখন । কিন্তু আমার মনে হয় আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ঐ বয়সে এইরূপ মহান ব্যক্তিত্যের সান্নিধ্যের সুযোগ দিয়ে আমার প্রতি এক অপরিসীম করুনা ও দয়া দেখিয়েছেন।

কিছু দিন পর খবর পাওয়া গেল যে মির্যা সাহেব অক্টোবর (১৯০৪ খ্রী:)-এর শেষ দিকে শিয়ালকোট সফরে আসবেন। সেই সময় মা স্বপ্নে দেখলেন যে, এক রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে তিনি ছাদওয়ালা গলিতে ঢুকলেন। তারপর এক বাসায় ঢুকে দোতালায় তিনি আবার সেই বুজুর্গ ব্যক্তির দেখা পেলেন, যাকে তিনি পূর্বেও স্বপ্নে দেখেছিলেন। তিনি (ঐ ব্যক্তি) জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি এখনো বিশ্বাস করেন না?' মা বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমি বিশ্বাস করি।' নির্দ্দিষ্ট সময়ে মির্যা সাহেব তার পরিবারের সদস্য ও কিছু শিষ্যদের নিয়ে শিয়ালকোর্টে এলেন। সেদিন ছিল অক্টোবরের ২৭ তারিখ। তাঁর আগমন শহরে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। রেল স্টেশনের বাইরে এক বিরাট জনতা জমা হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষ তাঁর নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল। যাত্রা পথে ও তাঁর থাকার জায়গা পর্যন্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। আমার বাবা ও চৌধুরী মোহাম্মদ আমীন রেল স্টেশনে এই মহান অতিথির আগমন দেখতে গিয়েছিলেন। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু আমাদের ঘোড়ার গাড়ী থেকে আমরা শুধু মাত্র এক বিরাট জনতার হুল্লোড় ও নড়াচড়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি। আমার মামা যিনি এই ভীড়ের মধ্যে ছিলেন, পরে আমার কাছে সবিস্তারে তাদের যাত্রার বিভিন্ন খুটিনাটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন।

পরদিন সকাল বেলা, বাবা তখন কোর্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। মা বাবার কাছে এলেন, তারপর বললেন, 'তিনি যাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন এই ব্যক্তিই তিনি কিনা তা যাচাই করার জন্য বাবা যদি অনুমতি দেন তবে মা তাকে দেখার জন্যে যেতে পারেন।

মা বললেন, যদি এই ব্যক্তিই আমার স্বপ্নে দেখা সেই ব্যক্তি হন আর আমি তাঁকে না মেনে চলে আসি তবে আল্লাহ্ যে আমাকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন তার প্রতি আমার অবজ্ঞাইতো প্রকাশ পাবে।

বাবা বললেন, দেখ এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আর এ ব্যাপারে আমাদের দু'জনের দুই পথে চলা ঠিক নয়। আমি তো এই ব্যাপারে পড়াশুনা করছি। পরে আমরা এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবো।

মা বললেন, তুমি তো লেখা-পড়া জানা জ্ঞানী লোক। আর আমার কোন লেখা-পড়া নেই। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, আল্লাহ তাআলা তার অপার অনুগ্রহে আমাকে সব সময় সত্য পথেই পরিচালিত করছেন। তাই যদি আমি দেখি যে, তার পরিচালিত ও নির্দেশিত পথই সত্য (অর্থাৎ মির্যা সাহেবই সেই ব্যক্তি) তাহলে তাঁর ইচ্ছামতই আমি অগ্রসর হবো। আর যদি তা না হয়, তাহলে তোমার সাথে আলাপ করে দু'জনে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

বাবা বললেন, কিছু দিন দেরী করলে তো কোন অসুবিধা নেই। আমাকে আমার অনুসন্ধানের ফলকে উভয় দিক দিয়ে বিচার করার সুযোগ দিতে হবে। এইরূপ গরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সবদিক দেখতে হয়। মা বললেন, তোমাকে তো আমার মনোভাব জানিয়েছি।

তারপর বাবা আর অপেক্ষা করলেন না, কোর্টে চলে গেলেন। আল্লাহ তাআলা মার অন্তরের বেদনা জানতেন। মা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এর ফল কি হবে? অত্যন্ত কাতর ভাবে তিনি দোয়ায় মগ্ন হয়ে রইলেন। আল্লাহ তাআলার প্রতি তার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল খাঁটি। তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন, মহান প্রভূ এতদিন তাকে পথ প্রদর্শন করে আসছেন, এখনও তিনি তাকে দ্বিধা দ্বন্দের মাঝে ছেড়ে রাখবেন না। পরামর্শ চাওয়ার মত কেউ ছিল না। স্বয়ং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া তিনি আর কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন?

মধ্যাহ্নের কিছুপরেই তিনি তার দীর্ঘ প্রতিক্ষিত যাত্রায় বের হলেন, যাকে তিনি তার অন্তরের মধ্যে থেকে এত গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়ে আসছেন। আমি তার সঙ্গে ছিলাম। মা তার স্বপ্নে দেখা বাড়ীটা চিনতে পারলেন। আমরা দোতালায় উঠে হযরত উম্মুল মু'মিনিন (মির্যা সাহেবের স্ত্রী)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। মা তাঁকে অনুরোধ জানালেন যেন তিনি এক নজর মির্যা সাহেবকে দেখতে পারেন সে ব্যবস্থা করতে। এই সংবাদ যখন মির্যা সাহেবকে জানানো হলো, তখন তিনি খবর পাঠিয়ে জানালেন, কিছুক্ষণ পরে সামনের পথে তিনি মসজিদে নামাজ

পড়তে যাবেন। তখন তার স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণ বসবেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আসলেন, উম্মুল মু'মিনিনের সঙ্গে বসলেন, তার থেকে কয়েক ফুট দূরে মা ও আমি বসেছিলাম। যেই মা তাঁকে দেখলেন তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। স্মিত হাসি দিয়ে তিনি বললেন, 'হুজুর আমি বয়আত (আনুগত্যের ও মান্য করার শপথ) নিতে চই'। তিনিও (মির্যা সাহেব) সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'তাহলে আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন বলে তিনি বয়আতের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় উচ্চারণ করে গেলেন। মাও সাথে সাথে আউড়ে গেলেন। শেষে তিনি নিরবে দোয়া করলেন। আমি, মা ও পরিবারের অন্যান্য মহিলারা তাতে হাত উঠালাম। দোয়া শেষে তিনি উঠে চলে গেলেন। পরবর্তী কালে আমি আমার নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে তাঁর পক্ষে এই কাজটি ছিল একটি ব্যতিক্রম, বিশেষত যখন বয়আত কারিনীর স্বামী নিজে এই আন্দোলনের সদস্য নয়। কোন প্রশ্ন করা নাই, বয়আতের শর্তাবলীর ব্যাপারে কোন কথাবার্তা নাই, হুট করে বয়আত গ্রহণ করা, বোধ হয় দু'জনেই আধ্যাত্মিক ভাবে এই ব্যাপারে পরিচালিত হয়েছিলেন।

মা'র হৃদয় প্রশান্ত হলো। তার অনুসন্ধান তাকে এক আত্মিক স্বর্গে পৌঁছে দিল। মা তাঁকে (মির্যা সাহেবকে) জীবনে আর কোন দিন দেখেন নাই (অবশ্য স্বপ্নে ছাড়া)। কিন্তু ঐ আনুগত্যের শপথে তিনি ছিলেন অবিচলিত, সম্পূর্ণ নিবেদিত, শত বিরোধীতা ও ঝঞ্ঝার মাঝেও। প্রায় এক তৃতীয়াংশ শতাব্দী পর তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি পূর্ণভাবে তার বয়আতে অনুগত ছিলেন। কোন কিছু তাকে বিচ্যুত করতে পারে নাই, তার বিশ্বাস ছিল পরম শান্ত, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে তা সমুন্নত।

বয়আত গ্রহণের পর মা প্রায় আধ ঘন্টা উম্মুল মু'মিনিনের সঙ্গে অবস্থান এর ফলে আমৃত্যু তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যখন আমরা ঘরে ফিরে আসছিলাম মা হয়তো অনুভব করতে পারছিলেন যে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে মা প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে, যে মহামহিমের আঙ্গুলী হেলনে তিনি দিক নির্দেশ পাচ্ছেন, যাঁর অমোঘ নির্দেশকে তিনি কখনো সামান্য হেলা করেন নাই, তিনি তাকে নিশ্চয়ই সব পরীক্ষায় সহায়তা করবেন। বাবার সঙ্গে মায়ের কোন দিনই কোন বড় ধরনে মতবিরোধ ঘটে নাই। আর এখন এমন এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত হয়েছেন যার উপর তার আত্মার পরিত্রাণ নির্ভর করছে। বাবা যতক্ষণ ঘরে না ফিরলেন মা ততক্ষণ কাতর ভাবে দোয়ায় রত ছিলেন।

তারপর বাবা এলেন। আমি নিজে সেই মোকাবেলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম।

'তুমি গিয়েছিলে?' বাবা অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্বেগের সাথে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তবু তার কণ্ঠে ছিল চিরাচরিত ভালবাসার টান।

'হ্যাঁ'

'তারপর?'

'তিনিই সেই বুজূর্গ।' মা যেন একটু কাঁপছিলেন।

'আমার মনে হয়, তুমি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাওনি'।

'আমি বয়আাত গ্রহণ করেছি', মা তার ডান হাতটা বুকের উপর নিয়ে বললেন। মুহূর্তের জন্য বাবার মুখটা পান্ডু বর্ণ হয়েছিল, ঠোঁট কেঁপে উঠে ছিল, কিন্তু তিনি সামলে নিলেন আর বললেন, 'খুব ভাল হয়নি'। মা প্রতি উত্তর দিলেন- ' আমি আমার বিশ্বাসের দাবী পূরণ করেছি। এটা যদি তোমার মনোপুতঃ না হয় তাহলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আমি আর কি করতে পারতাম। যদি আমার কাজ তোমার অপছন্দ হয় তবে তুমি তোমার খুশীমত ব্যবস্থা নিতে পার। আমার নিজের ব্যাপারে আমি বলতে পারি যে এত দিন যিনি আমাকে দেখেছেন, রিজিক দিয়েছেন, তিনিই এখনো আমাকে দেখবেন।' বাবা নিজের কাজের ছেলেটাকে ডাক দিয়ে বললেন, আমার বিছানা পাশের ঘরে নিয়ে পাতো। মাও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে চাকরকে বললেন, উনার বিছানা বাইরের কাচারী ঘরের পুরুষদের সঙ্গে নিয়ে পাতো। বাবা এতে ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, কেন কেন সেখানে কেন? কারণ আল্লাহ তাআলা তার অশেষ করুণায় আমাকে আলো দিখিয়েছেন, আর তুমি এখনো অন্ধকারে আছো। বাবা বুঝতে পারলেন– মা'রই জিত হয়েছে। সে-ই তো সবক্ষেত্রে জিতবে বলে তিনি কাজের ছেলেকে চলে যেতে বললেন। এক বিরাট সংকট থেকে সবাই পরিত্রাণ পেলো। কিন্তু বাবার তখনো সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকী, মাও দিন রাত দু'জনের আত্মিক মিলনের জন্য দোয়ায় ডুবে রইলেন।

চৌধুরী মোহাম্মদ আমীন এই আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। এখন যখন বাবা আগে বাড়তে ইচ্ছা করলেন তিনি আমীন সাহেবকেও সঙ্গে নিতে চাইলেন। আমীন সাহেব বললেন, তিনি এখনো কিছু কিছু বিষয়ের খুটিনাটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে চান। তাই বাবা ও আমিন সাহেব দু'জনে মিলে ঠিক করলেন মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে বিস্তৃত আলাপ করবেন। মৌলভী নূরুদ্দীন ছিলেন মির্যা সাহেবের সবচেয়ে বিখ্যাত ও ঘনিষ্ট শিষ্য, যিনি তাঁর সঙ্গে শিয়ালকোর্ট এসেছিলেন।

তারা দু'জনেই তাঁর সঙ্গে বিস্তৃত আলাপ করতে চাইলে তিনি খুব খুশী হয়ে বললেন প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দু'এক ঘন্টা তিনি তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন। মোট চারটি আলোচনা হয়েছিল এবং ঐ সময়ে সৌভাগ্যক্রমে আমি

নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবকে খুব কাছে থেকে দেখার সেটা একটি সূবর্ণ সুযোগ হয়েছিল। হয়তো তিনিও আমাকে তাঁর বন্ধুর ছেলে হিসাবে মনে রেখেছিলেন। শেষ অধিবেশন থেকে ফেরার পথে বাবা চৌধুরী আমীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তিনি মনস্থির করতে পারবেন কিনা। তাতে আমীন সাহেব বললেন, যে প্রশ্ন গুলো তিনি উঠিয়ে ছিলেন তার সন্তোষজনক উত্তর তিনি পেয়েছেন।

'তাহলে আমরা কি বয়আত করবো?'
'তোমার কি মনে হয়?'
'আমি তো প্রস্তুত, তুমি রাজী তো?'

'খুব ভাল কথা। তাহলে কাল ভোরে ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়ার পথে আমাকে ডেকে নিও। দু'জনে এক সঙ্গে বয়আত করা যাবে।'

পর দিন ভোরে ফজরের নামাজের জন্য আমি ও বাবা মসজিদের পথে চৌধুরী মোহাম্মদ আমীনকে ডাকতে গেলাম। কিন্তু তিনি জানালেন, বয়আতের ফলে যে দায়িত্ব চাপবে তা বহন করার মত সামর্থ তিনি এখনো অর্জন করেন নি। বাবা ও আমি মসজিদে চলে গেলাম। ফজরের পর বাবা স্বয়ং মসীহ্ মাওউদের (আ:) হাতে বয়আত করেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম (আমার বয়স তখন ১১/১২)।

মা'র কিছুদিন পরে বাবার এই আন্দোলনে যোগদানের ঘটনার মাধ্যমে মা'র সেই স্বপ্নের সত্যতা পূর্ণ হলো যে স্বপ্নে তিনি একটি গ্যালারীতে আগে গিয়ে বাবার জন্য একটি আসন দখল করে রেখেছিলেন। এর ফলে আমাদের পরিবারের আগের সেই ঐক্যতা ফিরে এলো।

প্রকৃত পক্ষে মা তো স্বপ্নেই বয়আত গ্রহণ করে ফেলেছিলেন। পরে প্রকাশ্যে তা বাস্তবায়ন করেছিলেন। নিজের সারা জীবনে তিনি যে শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থেই বয়আত করেন নাই, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বয়আত করেছলেন, তার প্রমাণ ও তিনি দিয়ে গেছেন। প্রতিটি প্রভাতই শুধু নয়, প্রতিটি চলমান মুহূর্ত স্বাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তিনি তার বিশ্বাস ও ঈমানে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছিলেন। প্রথম থেকেই তার ভালবাসা ছিল 'ভালবাসার জমিনে' প্রোথিত। যখন যেখানেই তিনি মহান আল্লাহ্, পবিত্র রসূল (সাঃ) ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জালওয়া, নূর ও সত্যতা দেখতেন– তার এই ভালবাসা ও মহব্বত আরো উথলে উঠত। স্রষ্টার প্রতি কোন কর্তব্যেই যেন অবহেলা না হয়, তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন কর্তব্যই যেন অপ্রতিপালিত না থাকে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পর্যায় পর্যন্ত তিনি লক্ষ্য রাখতেন। ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে মা'র জীবন প্রত্যেকের জন্য কল্যাণে ভরে উঠত। প্রত্যেকের জন্য তিনি ছিলেন চির কল্যাণের সূত্র।

অনুচ্ছেদ– ৫

আত্মোৎস্বর্গীকৃত মা

যে রহস্যময়ী অদৃশ্য বন্ধন মা ও তার সন্তানের মধ্যে থাকে তা এক স্বর্গীয় আশীষ। জন্মের মাধ্যমে তাদের দৈহিক সম্বন্ধ ছিন্ন হলেও তাদের সেই বন্ধন দিনকে দিন বাড়তেই থাকে। মা-এর জন্য সন্তান সন্তানই। তার বয়স যতই বাড়ুক, সে যত বড় পদেই অধিষ্ঠিত হউক না কেন এই বন্ধন এমনই যে এমন কি মা'র মৃত্যুর পরও তা করব থেকে হৃদয়ের তন্ত্রী ধরে টান দেয়। যার মা মারা যায় সেই সন্তানের জীবনের ভীত নড়ে উঠে। জীবন তার কাছে আর তেমন আকর্ষণীয় থাকে না।

মা'র সাথে আমার সম্বন্ধ ছিল বিশেষ ভাবেই দৃঢ়। মা'র ছিল খুবই অনুভূতিশীল কোমল ও তাজা অন্তর। আমি ছিলাম সেই অন্তরের সকল ভালবাসার লক্ষ্যবিন্দু। এর একটা কারণ ছিল এই যে, আমার আগের দু'টো ভাই শিশু কালেই মারা গিয়েছিল, আর আমি বালক বয়সে পৌছেছিলাম। এর দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় এই যে, সেই বয়সেই আমার চোখের পাতায় দানা উঠেছিল, যার ফলে দশ থেকে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি খুব ভুগছিলাম। সেই কস্টের দিনে মা-ই ছিল আমার একমাত্র সাথী। গ্রীস্মকালের প্রায় সবটা সময় আমাকে অন্ধকার ঘরে কাটাতে হতো। বেশীর ভাগ সময় মা-ই আমার সাথী হয়ে থাকতেন। আমি সেই অসুখে এত মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হয়েছিলাম যে শেষ পর্যন্ত চোখের পাতার ভেতর দিকে লোম গজাতে শুরু করে; ফলে বাধ্য হয়ে পাতার ভিতর দিকে অপারেশন করে কিছুটা ফেলে দিতে হয়। এই রকম অবস্থায় মা'র অপরিসীম স্নেহ ও সেবা, আমার জন্য তার কাতর দোয়া, আমার পরম সান্তনার বিষয় ছিল। তার থেকে আমার আলাদা থাকার সময়টুকু ছিল উভয়ের জন্যই এক যন্ত্রণাময় অবস্থা।

আমার চোখের সমস্যার জন্য ঐ সব বৎসরগুলোতে যদিও আমি স্কুলে হাজির হতে পারতাম কিন্তু লেখাপড়া করতে পারতাম না। শুধুমাত্র শীতের সময়টুকুতেই আমি পড়াশুনা করতে পারতাম। তবু আল্লাহর ফজলে আমি ক্লাসে পিছনে পড়ি নাই, বা কোনো বৎসর নষ্ট হয় নাই। চৌদ্দ বৎসর বয়সে আমি মেট্রিক পরীক্ষায় পাশ করি প্রথম বিভাগ নিয়ে, আমাদের স্কুলে প্রথম হয়ে। বাবা আমাকে লাহোর গভঃ কলেজে স্নাতক পড়ার জন্য পাঠালেন। জীবনের প্রথম আমি বাড়ী থেকে দূরে বাস করতে গেলাম। মার জন্য সেটা ছিল আর এক পরীক্ষা। মা জেদ

ধরলেন যে প্রতি সপ্তাহে একবার আমাকে বাড়ী যেতে হবে, শেষ পর্যন্ত দু'সপ্তাহে একবার হিসাবে রেহাই পেলাম। বাড়ী থেকে ফিরে এসেই মাকে চিঠি লিখে জানাতে হতো যে আমি নিরাপদে লাহোর পৌঁছেছি। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর দ্বিতীয় বৎসর শীতকালে আমার চোখের অসুখ পুরোপুরি আরোগ্য হলো। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষার জন্য পড়াশুনার ভাল সময় পেলাম। ফলে ভাল নম্বর নিয়ে পাশও করলাম। সেটা ছিল ১৯০৯ সালের বসন্তকাল। এই দু'বৎসরের কলেজ জীবন আমাকে অনেকটা আত্মনির্ভরশীল করেছিল, আর মার থেকে দূরে থাকার কষ্টটা সহ্য করতে শিখিয়েছিল।

আমার কলেজ জীবনের প্রথম লম্বা ছুটির সময় বাবা একটা চিঠি পেলেন। জামাআতের প্রথম খলীফা হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব বাবাকে জানালেন যে এখন আমার আনুষ্ঠানিক ভাবে বয়আত নেওয়ার সময় হয়েছে। আমি নিজে কিন্তু ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর যখন তাঁকে (হযরত মসীহ মাওউদ আ:) প্রথম বার লাহোরে দেখেছিলাম তখন থেকেই তাঁর প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত হয়ে গিয়েছিলাম। এরপরও মা-এর স্বপ্নের সময় আমার সেই আনুগত্য আরো দৃঢ়তর হয়েছিল। মা'র বয়আত গ্রহণের সময় আমার উপস্থিতি, বাবার বয়আতের সময় আমার উপস্থিতি, এগুলোতে আমার ধারণা হয়েছিলো যে আমারও বয়আত হয়ে গিয়েছে এবং আমি আনুষ্ঠানিকভাবেই এই আন্দোলনের একজন সদস্য। মৌলভী নুরুদ্দীনের ঐ পত্র স্মরণ করিয়ে দিল যে গুরু ও শিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভক্তের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। বাবা যখন থেকে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তখন থেকেই প্রতি সেপ্টেম্বর মাসে যখন জেলা আদালতগুলো বন্ধ থাকতো, কাদীয়ান (যে গ্রামে মির্যা সাহেব থাকতেন) গিয়ে কাটাতেন, আবার ডিসেম্বর মাসেও বাৎসরিক জলসায় (সম্মেলন) যোগ দিতেন। তখন আমাকেও সঙ্গে নিতেন। কাজেই মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেবের পত্র পাওয়ার পর বাবা সে বৎসর (১৯০৭ খ্রী:) আমাকে কাদিয়ান নিয়ে যান এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর আমি মসীহ মাওউদ (আ:)-এর নিকট বয়আত গ্রহণের জন্য আবেদন করি। তিনি সানন্দে অনুমতি দেন এবং আমার বয়আত গ্রহণ করেন। এই ভাবেই এই নগণ্য অধম বান্দাকে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলা তার অশেষ করুণায় এই মহান পুরুষের সাহাবী হওয়ার পরম সৌভাগ্য দিয়েছিলো। সে সৌভাগ্য আমার মা ও বাবা তিন বৎসর আগেই পেয়েছিলেন।

আমি মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেবের কাছে বিশেষ ভাবেই কৃতজ্ঞ যে, উপযুক্ত সময়েই তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কয়েক মাস পরেই সেই মহাপুরষের তিরোধানের পর তার নিজ হাতে বয়আত গ্রহণের সেই পরম সৌভাগ্যের অবসান হয়েছিল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের শেষ দিকে লাহোর এসেছিলেন। তার কাছে যে ইলহামগুলো নাযেল হচ্ছিল তাতে তার মৃত্যু যে নিকটবর্তী তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্ব দিন পর্যন্ত তার উপর ন্যস্ত ঐশী মিশন প্রচারে সর্বদা কঠোরভাবে ব্যস্ত রইলেন। মে'র ২৫ তারিখ রাত্রে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৬ তারিখ সকাল দশটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যু সংবাদ জামাআতের সদস্যদের উপর প্রলয় সংবাদের মতই ভয়ংকরভাবে এলো। কিন্তু সবাই ঐশী ইচ্ছার মোকাবেলায় পরম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখালো এবং উচ্চ মার্গের গাম্ভীর্য্যের সাথে এই শোক বহন করলো।

তার পবিত্র মরদেহ কাদিয়ান বহন করে নেওয়া হয়। আমি সেই শবযাত্রায় শরীক ছিলাম। ২৭ শে মে বিকালে জামাআতের যে বার শ'র মত সদস্য সর্বস্থান থেকে কাদীয়ানে সমবেত হয়েছিল, সবাই সর্বসম্মতভাবে হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেবকে খলীফা নির্বাচিত করে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তিনি তারপর জানাজার নামাজ পড়ান ও তাঁকে দাফন করা হয়।

কলেজে আমার শেষ দু'বৎসর বেশ আনন্দেই কেটেছিল। চোখের অসুস্থতায় আর আমি পঙ্গু ছিলাম না, স্বাস্থ্যও ভাল যাচ্ছিল। ফলে খুব নিয়ম করে পরিকল্পিতভাবে পড়াশুনা করতে পারছিলাম এবং ক্লাসের প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছিলাম। আমার প্রফেসরগণ আমার উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের শুভাশীষ পেতাম সব সময়। সেপ্টেম্বর ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বাবা মারীতে বেড়াতে যান, আমাকে সঙ্গে নেন। প্রথম বারের মত আমি শৈল নিবাসে গিয়েছিলাম। পুরো সময়টা ছিল খুবই আনন্দময়।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের গ্রীস্মের বন্ধ এবোটাবাদে কাটাবো বলে এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেললাম। ডিগ্রী পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। বন্ধের শেষ দিকে শিয়ালকোর্টে ফিরে এলাম। তখন ছিল রমজান মাস। মা বললেন যে, আমি এবোটাবাদে রোজা রাখতে পেরেছি কি না তা নিয়ে বাবা ভাবছিলেন। তাই মা তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সে ঠিকই রোজা রাখবে। আমি তাকে জানালাম মায়ের এই বিশ্বাসের অমর্যাদা আমি করিনি। আমি সে দিন পর্যন্ত রোজা রেখেছিলাম। আমি তখনো জানতাম না যে সফরে রোজা রাখা বাধ্যতামূলক নয়।

শিক্ষাবর্ষ শেষে সবগুলো বিষয়েই আমি প্রথম পুরস্কার পেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আমি আরবীতে সম্মান সহ প্রথম শ্রেণী পেয়ে প্রথম হই। আরবীতে এম, এ, পড়ার জন্য আমাকে স্কলারশীপ দেওয়া হয়। কিন্তু তা আমি নিতে পারি নাই, কেননা বাবা আমার জন্য অন্য কিছু ইচ্ছা করেছিলেন। যদি আমার ইচ্ছায় হতো তবে আমি হয়তো আরবীতে এম. এ. পড়ে শিক্ষকতাই বেছে নিতাম। কিন্তু

বাবা ছিলেন আরো উচ্চাভিলাষী। তিনি চাইলেন, আমি যেন বিলাতে গিয়ে 'ল' পড়ে 'বারে' যোগ দেই এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রতিযোগীতা করি। তখন আমার বয়স মাত্র আঠার এ সবের জন্য তখন প্রচুর সময় ছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ (মসীহ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আ:)-এর পর প্রথম খলীফা) বাবার ইচ্ছা অনুমোদন করলেন এবং ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হলো। কিন্তু এই নিষ্পত্তি মা'র উপর প্রচন্ডভাবে পড়লো। এত দীর্ঘ দিনের জন্য আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে জেনে তিনি ভেঙ্গে পড়লেন। তবু ধৈর্য্য ও দোয়ায় রত হয়ে তিনি দৃঢ় রইলেন। আমার যাওয়ার দিন পর্যন্ত তিনি পুরোপুরি অভিভূত হয়ে পড়েননি।

বাবা আমাকে সঙ্গে করে বোম্বে পর্যন্ত এলেন বিদায় দিতে। এতো দূরের পথে আগে আমি কখনো একা যাই নি, তাই তা ছিল আমার জন্য খুবই সুখপ্রদ। আমার দৌড় ছিল একদিকে পেশওয়ার. অন্যদিকে কাদিয়ান। বোম্বে পর্যন্ত এই ভ্রমণ আমার ও বাবার জন্য সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। বাড়ীতে শেষ দিনগুলোতে আমি বুঝতে পারছিলাম যে বাবাও আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সব সময় সামলে রাখতেন। বোম্বে পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রাপথে আমাদের মধ্যে খুব কম কথা হয়েছে। হোটেল থেকে জাহাজ ঘাট পর্যন্ত বাবা এলেন, তারপর নীচের দিকে চেয়ে সালাম ও বিদায় জানিয়ে আমার সঙ্গে হাত মেলালেন। আমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া বা বিদায়ের বাণী উচ্চারণ করার সাহস পাচ্ছিলেন না, পাছে চোখে জল এসে পড়ে। আমি বুঝতে পারছিলাম, বাবা দোয়ার মাধ্যমে আমাকে অনবরত সাহায্য করছেন এবং করতে থাকবেন।

মা কিভাবে এই বিচ্ছিন্নতা সহ্য করেছিলেন তা আমি জেনেছিলাম তিন বৎসর পর বিলাত থেকে ফিরে এসে। প্রতি সপ্তাহেই আমি বাড়ীতে চিঠি লিখতাম, তার জবাবও পেতাম। কিন্তু এই যোগাযোগের মাধ্যমে মনের ভেতরের আবেগ ও বেদনার অনুভূতি জানা যেতো না, যদিও তাতে আন্তরিকতা ও স্নেহের সুর ধ্বনিত হতো ঠিকই। তার মনের ভিতরে যে বিরহের তুফান বইত তার একটি ঘটনা মা-ই আমাকে পরে বলেছিলেন।

আমাদের বোম্বে রোওনা হওয়ার তিন দিন পর আমার দাদী মা'কে বলল, 'কাল আমার ছেলে বোম্বে থেকে ফিরে এলে মনে শান্তি পাই।' মা আর সহ্য করতে পারলেন না, 'মা আপনার ছেলে তো সমুদ্র পাড়ি দেয়নি যে তার জন্য আপনি একথা বলছেন। তিনি একদিন আগে পরে এলেই বা কি? মা স্বীকার করেছিলেন যে মুখ ফসকে একথা বলার পর তিনি অনুশোচনা করেছিলেন।

বোম্বে থেকে রওনা হয়েছিলাম সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ। অস্ট্রেলিয়ান লয়েড কোম্পানীর ৪০০০ টনের এই জাহাজ এস.এস. কোয়েবার প্রচন্ড মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দারুন বেগে উঁচু ঢেউয়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ট্রিয়েস্তের (ইটালীর বন্দর) উদ্দেশ্য চলছিল। যাত্রার এক ঘন্টার মধ্যেই আমি 'সী সিকনেসে' আক্রান্ত হলাম। পরবর্তী চারদিন বিরামহীন ও অবর্ণনীয় যাতনা ভোগ করলাম। মৌসুমী এলাকার বাইরে জাহাজ পৌঁছার পর যাত্রা খুবই আনন্দময় হয়ে গেল। প্রত্যেক মুহূর্তই উপভোগ্য ছিল। ট্রিয়েস্ত থেকে ট্রেনে করে মিউনিখ, ফ্রাঙ্ককোর্ট, ব্রাসেলস ও ওসটেন্ড হয়ে যাত্রা ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ডোভার প্রণালী অতিক্রম করে সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে, (১৯১১ খ্রীঃ) খুব ভোরে আমি লন্ডন পৌঁছাই।

আমার চোখের পাতার অসুখ যদিও সেরে গিয়েছিল, কিন্তু আমার ডান চোখটি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই আমাকে বলা হলো যে যদিও আমি আই.সি.এস পরীক্ষায় পাশ করি তথাপি মেডিকেল টেস্টে আমি পাশ করতে পারবো না। তা হলে বাবার পরিকল্পনার ঐ অংশটুকু বাদ দিতে হয়। লন্ডনের কিংস কলেজে এল.এল.বি ও 'লিঙ্কন্‌স ইন এ বার' (ব্যারিস্টার এ্যাট ল) এর জন্য আমি যোগ দিলাম। জুলাই ১৯১৪ খ্রীঃ আমাকে 'বারে' ডাকা হলো। সেই বৎসরই অক্টোবরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে আমি এল এল বি পাশ করি।

শুধু মাত্র বাবা মার থেকে দূরে থাকার বেদনা ছাড়া লন্ডনে আমার সময় খুব ভালই কেটেছিল। যুদ্ধপূর্ব ইংল্যান্ডে আমার জীবন নিজেই একটা বিরাট শিক্ষা ছিল। এছাড়াও আমি বন্ধের দিনগুলিতে কন্টিনেন্টে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলাম, যা আমার জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছিল। অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ত জন্মেছিল, দু'টি মহাযুদ্ধের মাঝেও তা অটুট ছিল। শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুই সেই বন্ধুত্বের অবসান ঘটাতে পেরেছিল। তাদের মধ্যে দু'জন এখনো জীবিত। একজন ইংল্যান্ডে, একজন ফীনল্যান্ডে। (এটা খুব সম্ভবত– ১৯৮০ সনের কথা–অনুবাদক)

সব সময় আমি খলীফাতুল মসীহকে (প্রথম) নিয়মিত চিঠি লিখতাম, তিনিও দোওয়া করে উত্তর দিতেন। তার নিজের হাতের লেখা চিঠিগুলো আমার বিরাট সান্তনা ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকতো। ১৯১৪ খ্রীঃ ১৩ই মার্চ প্রথম খলীফার মৃত্যুর পর দিন কাদীয়ানে উপস্থিত জামাআতের সদস্যদের বিরাট সংখ্যা গরিষ্টতার ভোটে হযরত সাহেব জাদা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফা নির্বাচিত হন। কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী লোকও অবশ্য ছিল। যাই হউক সেই সময়ে মা আবার তার স্বপ্নের মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছিলেন। তিনি

একটা স্বপ্নে দেখলেন যে, বন্যা হচ্ছে, রাস্তা-ঘাট বন্যার পানিতে ডুবে যাচ্ছে। লোক-জন বাড়ীর ছাদে আশ্রয় নিচ্ছে। তিনি শুনতে পেলেন কে যেন বলছে রাস্তার পানিতে একটা খরগোশ ভেসে বেড়াচ্ছে, যে মানুষের মত কথা বলতে পারে। তারপর তিন দেখলেন ঐ খরগোশটি একটি কাঠের বোর্ডের উপর ভাসতে ভাসতে এ বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে উপস্থিত হয়েছে। মা ছিলেন দোতালায়, ডেকে বললেন 'খাজা তুমি কি কথা বল? সেটা বলল- 'হ্যাঁ আমি বলি'। মা আবার প্রশ্ন করল- 'খাজা, নিজের দিকে খেয়াল রেখো যেন ডুবে না মর'। এটা আবার উত্তর দিল, 'আমি যদি ডুবি তো অনেককে নিয়ে ডুববো'।

কিছুদিন পর তিনি আবার একটি স্বপ্ন দেখেন। দেখেন দিগন্ত বিস্তৃত এক মাঠের মাঝখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, মনে হচ্ছিল কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য তারা অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈদ্যুতিক বাতির মত বাতির আকারের একটি উজ্জল আলো মাটি থেকে উপর দিকে উঠছে। দেখা গেলো যেন নীচ থেকে কোন যান্ত্রিক উপায়ে প্রপেলারের দ্বারা এটাকে উপরে উঠানো হচ্ছে। এই আলো যেই লোকের চোখে পড়লো অমনি সবাই এটার দিকে ফিরে চাইলো ও ভাল করে দেখার জন্য এটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমার মা ও এটার দিকে এগিয়ে গেলেন, বাবাকেও ডাক দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি এসে এটা মাটির কাছাকাছি থাকার সময় ভাল করে দেখে নিতে, কেননা এটা উপরে উঠে গেলে আর তেমন আনন্দ পাওয়া যাবে না। বাবা এ কথা শুনে আলোটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। এটিও ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাচ্ছে। তারপর আকাশের সীমানায় পৌছে তা আলোতে চতুর্দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে ফেললো। মা খেয়াল করে দেখলেন, একদল লোক ওভারকোট ও তুর্কি টুপি পড়ে কিছু দুরে এক খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, এই উজ্জ্বল আলোর দিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। মা বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'ওরা কারা, কেনই বা এই মনোহর আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যের প্রতি তাদের এই অনীহা। বাবা বললেন, তারা খালের জলের স্রোত ধারা দেখতে ব্যস্ত।

প্রথম খলীফার ইন্তেকালের পর মুষ্টিমেয় কিছু লোক নির্বাচিত দ্বিতীয় খলীফা হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের হাতে বয়আত করা থেকে বিরত থাকে। বাবা সে সময় লন্ডনে আমাকে লিখলেন এটি একটি ঈমানের প্রশ্ন, আমি যেন দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার পরিচালনায় আমার নিজের সিদ্ধান্ত নেই। মা লিখলেন, তিনি দ্বিতীয় খলীফার কাছে বয়আত করেছেন। আমাকেও বয়আত নেওয়ার জন্য বললেন। জামাআতের একজন প্রথম সারির সদস্য খাজা কামাল উদ্দীন ১৯১২ খ্রী: শরৎকালে লন্ডন এসেছিলেন, তখন মাঝে

মাঝে আমার সাথে খেলাফত সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। তিনি আমাকে তার নিজের দুটি স্বপ্নের কথাও বললেন। তা থেকে আমি এতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে খলীফার কর্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রথম খলীফার মতামতের সাথে তার দারুন বিরোধীতা আছে। কাজেই আমি মার নির্দেশ তড়িৎ পালনে কোন দ্বিধা করিনি। বাবাও এক সপ্তাহ ইস্তেখারা ও কাতর হৃদয়ে দোয়ার পর দ্বিতীয় খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। আজ থেকে দুই তৃতীয়াংশ শতাব্দী আগের ঘটনা এটা। তারপর থেকে প্রতিটি প্রভাত এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে খেলাফতের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন বিদ্যমান।

বিলাত প্রবাসে বাবা-মার সঙ্গে এই যে দূরত্ব– তা থেকে আমার মনে বাবা-মার ভালবাসা সম্বন্ধে এক নতুন ও সত্যিকার অনুভবের সৃষ্টি হলো। তাদের ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপে ও গভীরতা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই তাঁদের জন্যও আমার মনে নতুন করে আরো গভীর ভালবাসার সৃষ্টি হয়। আমি ঠিক করে ফেল্লাম যে এবার দেশে ফিরে বাবার সন্তানবৎস্নেহ ছাড়াও তাঁর বন্ধূত্ব অর্জনের চেষ্টা করবো, যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে, আমি শুধুমাত্র তার অনুগত সন্তানই নই, তার অনুগত বন্ধু ও সুযোগ্য কমরেড। মাকে লিখলাম যে তাঁর জন্য আমি অসীম এক সমুদ্রের ভালবাসা নিয়ে আসছি, সময়ের সাথে সাথে যা শুধু বাড়তেই থাকবে। আল্লাহ্ তাআলার অশেষ কৃপায় আমার এই উভয় প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়েছিল।

আমাকে 'বার'-এ ডাকা হয়েছিল ১৯১৪ সালের জুন মাসে। কিন্তু আমার এল.এল.বি. পরীক্ষার জন্য অক্টোবর পর্যন্ত আমাকে লন্ডন থাকতে হয়। এদিকে আগস্ট মাসের প্রথম দিকে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় সব কিছুই যুদ্ধ প্রচেষ্টার নীচে চাপা পড়ে গেল। একটি বিকল্প ব্যবস্থায় বৃটেন ও ভারতের মধ্যকার ডাক যোগাযোগ ঠিক রাখা হলো। আগে লন্ডন থেকে স্থলপথে ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে মার্সেইলেস পর্যন্ত ডাক আসতো। সেখান থেকে পোস্ট অফিসের স্টীমার যোগে বোম্বে পর্যন্ত আসতো। এদিক থেকেও এভাবেই ডাক যেতো। কিন্তু যুদ্ধ শূরু হয়ে যাওয়ার ফলে বোম্বে থেকে ডাক পুরোপুরি সমুদ্র পথেই চলাচল করতে শুরু করলো। ফলে ডাক পেতে আগের চেয়ে এক সপ্তাহ সময় বেশী লাগতো। প্রথম যখন মা আমার সাপ্তাহিক চিঠি পেলো না, আর পোস্টম্যান তাকে জানালো যে যুদ্ধের ফলে ডাক যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে, মা সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। পরে যখন সাপ্তাহিক যোগাযোগের এই সূত্র পুরন হলো তিনি অনেকটা স্বস্তি পেয়েছিলেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমার দেশে ফিরে আসার ফলে তার সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান হয়েছিল। চিচ্ছিন্নতার এই মর্মবেদনা তার কাছে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি হয়ে রইল।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই আমি লন্ডন ত্যাগ করি। লাহোর পৌঁছে আমি ভাবলাম শিয়ালকোর্ট যাওয়ার চেয়ে আমার প্রথম কর্তব্য হবে খলীফাতুল মসীহর কাছে নিজেকে উপস্থিত করা ও তার হাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বয়আত করা। আমি তাই করেছিলাম। কিছুদিন পর আমার পরীক্ষার ফল এলো, আশানুরূপ ভাবেই সম্মানসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলাম। পাঞ্জাবের চীফ কোর্টে এ্যাডভোকেট হিসাবে তালিকাভূক্ত হয়ে আইন ব্যবসায় অনুমতি পেলাম। শিয়ালকোর্টে বাবার জুনিয়র হিসাবেই প্রথম ওকালতি শুরু করি। বাবা তখন শিয়ালকোর্টের সিভিল কোর্টের সেরা উকিল। তাঁর উচ্চ পেশাদারী মূল্য বোধের জন্য সবার শ্রদ্ধাভাজন। তার সুনামও ছিল খুব। তাকে আমার পরিচালক ও উপদেষ্টা হিসাবে পাওয়া ছিল পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

বাবা খুব রিজার্ভ ধরনের লোক ছিলেন। তার জীবন যাপন ছিল সবার অনুকরণীয়, ধার্মিকতার আর্দশ। নিজের জীবনে তিনি মোটা-মুটি কৃচ্ছ ভাবে চলতেন। কিন্তু আমাকে বলতেন নিজের আরামের দিকে খেয়াল নিতে। আমাদের বেশ বড় বাড়ী ছিল। তাতে আমাকে বেশ প্রশস্ত ও আনুসঙ্গিক সুবিধাদিসহ আরামদায়ক একটি এ্যাপার্টমেন্ট দেওয়া হয়। তিনি আমাকে বুঝতে দিলেন যে, আমার উপর তার পূর্ণ আস্তা আছে। আয় ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ, দেখাশুনা, খরচাদী ও সব বিষয়াদী পরিচালনার ভার তিনি আমার হাতেই তুলে দিলেন। তার হিসাব তিনি কখনো দেখতেন না। নিজের জন্যও আমি যতখুশী খরচ করতে পারতাম। এটা ছিল খুবই উদার ব্যবস্থা। কিন্তু আমি কোন সময় এই সুযোগের অপব্যবহার করিনি। মা-ও এই ব্যবস্থায় বেশ খুশি ছিলেন।

যখন আমি ওকালতি করতে লাহোরে চলে যাই, আর বাবাও তার ওকালতি বন্ধ করে কাদিয়ানে গিয়ে বাস করতে শুরু করেন, তখনও তার সম্পত্তির আয় আমার কাছেই আসতো। বাবার যখন কিছু প্রয়োজন হতো আমার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিতেন। তিনি কোন দিন হিসাব চাইতেন না। কিন্তু আমি হিসাব রাখতাম। তার উদ্বৃত্ত থেকে নিজের জন্য খরচ করার মত প্রয়োজন আমার কখনো হয়নি। একবার তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কেন একটি গাড়ী ক্রয় করছি না। আসলে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, আমিতো সহজেই তার জমা টাকা থেকে কিছু নিয়ে নিজের জন্য একটা গাড়ী কিনতে পারি। তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি ভাল দেখে একটা গাড়ী কিনি। আল্লাহর ফজলে আমাকে তার জমা টাকা থেকে নিতে হয় নাই। তার মৃত্যুর পর ঐ জমা টাকা তার এষ্টেটের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

বাবার শিক্ষকতায় আইন ব্যবসায়ে আমার বেশ ভালই অগ্রগতি হচ্ছিল। কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট জজ্‌গণ যখন আমার কেস পরিচালনার প্রশংসা তার কাছে করতেন,

তখন বাবা খুব খুশী হতেন। কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের প্র্যাকটিসের ব্যাপারে আমি পুরোপরি সন্তুষ্ট ছিলাম না, মনে হচ্ছিল কিসের যেন অভাব আছে। বোধ হয় সেখানে বুদ্ধিদীপ্ত মোকাবেলার অভাব ছিল। কারণ যাই হোক না কেন আমি লাহোর যাওয়ার একটি সুযোগ হাত ছাড়া করলাম না। 'ইন্ডিয়ান কেসেস' এর সহকারী সম্পাদক হিসাবে আমি ১৯১৬ খ্রীঃ আগস্টের শেষ সপ্তাহে লাহোর চলে আসি। তখনকার দিনে এই পত্রিকা ছিল একমাত্র ল' জার্ণাল, যাতে ভারতের উচ্চ আদালত ও প্রীতি কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটি কর্তৃক ভারতের আপীল কেসগুলির উপর যে রায় দেওয়া হতো তা প্রকাশ করতো। বাবা ঠিক করলেন ওকালতি থেকে এবার অবসর নেবেন। তাই সপ্তাহের অর্ধেক দিন আমাকে শিয়ালকোর্টে এসে বাবার কাজ গুটানোতে সাহায্য করতে হতো। তিনি নিজের জীবনের বাকী সময়টুকু ধর্মের জন্য ওয়াক্‌ফ করে কাদিয়ানে গিয়ে জামাআতের জন্য কাজ করতে শুরু করেন। মা আমাদের পিতৃপুরুষের আদি বাসস্থান দাস্‌কায় চলে গেলেন। কিন্তু তার সময় টুকুকে তিন ভাগে ভাগ করে দাস্‌কা, লাহোর ও কাদিয়ানে কাটাতে লাগলেন। তিনি জানতেন, বড় বউ হিসাবে শ্বাশুড়ীর চাবীর গোছা পাওয়ার পর তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? তাই বেশী সময় তিনি দাস্‌কায়ই থাকতেন। মুলতঃ মা এর প্রচেষ্টাতেই দাস্‌কায় আহমদীয়া আন্দোলনের একটি জামাআত গড়ে উঠে। বাবাও রমজান মাসটা দাস্‌কায় কাটাতেন।

দাস্‌কায় জামাআতের বিরোধীতা তেমন ছিল না। প্রধান বাধা ছিল নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি ঔদাসিন্য। কিন্তু মা'র পরোপকার ও অন্যান্য উদাহরণ অন্যদের মনে এই আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করে। একজন সনাতন মোল্লা তার গোঁড়ামীপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বিরোধীতা করতে শুরু করে এবং আন্দোলনের সম্বন্ধে কুৎসা রটাতে থাকে। কিন্তু মা'র বদান্যতা ও সহানুভূতি থেকে তাকেও বাদ দেওয়া হয়নি। একদিন এক পরিচারিকা মাকে ছোট বাচ্চাদের জামা কাপড় সেলাই করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো এগুলো কাদের জন্য সেলাই হচ্ছে। 'মোল্লার নাতিদের জন্য' মা সেলাই করতে করতে জবাব দিল 'তাই?' কিন্তু আপনি তো জানেন মোল্লা আমাদের কেমন শত্রুতা করে।

আল্লাহই আমার বন্ধু। আর আমার কোন শত্রু নেই। ছেড়া কাপড় পড়ে ছোট ছেলে-মেয়েগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা কিভাবে আমি সহ্য করবো। সেলাই শেষ করার পর তুমিই এগুলো নিয়ে মোল্লাকে পৌছে দিয়ে এসো। তাবে রাত্রিতে যেও যেন কেউ দেখে না ফেলে। তাতে হয়তো মোল্লা এগুলো নিতে লজ্জা পাবে।

একবার এক গরীব মুসলমান চাষীর গরু-বাছুর ক্রোক করা হলো, এক হিন্দু কুসীদজীবীর দেনার দায় শোধ করতে না পারার কারণে কোর্টের ডিক্রীমূলে। তার মধ্যে একটা বাছুর ছিল যা চাষীর ছোট্ট ছেলেটার খুবই প্রিয়। ছেলেটা দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে গেল, তারপর কাঁদতে শুরু করলো। তার কান্না মা শুনতে পেলেন। কাজের ছেলেটিকে ডেকে বললেন, ঐ মহাজনকে মূল টাকা দিয়ে যেন গরু-বাছুর গুলো ছেড়ে দিতে রাজি করিয়ে আসে, পরে তার সুদ ও মামলার খরচ দিয়ে দেওয়া হবে। মহাজন এতে রাজি হয়ে গরু-বাছুরগুলো ছেড়ে দেয়। বাচ্চাটি তার বাছুর নিয়ে মহানন্দে মার সামনে বাড়ী ফিরে যায়। তাতে মা পরম আনন্দ পান। মানুষের জন্য তার এত গভীর দরদ ও সহানুভূতি ছিল যে তার সাধ্যে যতটুকু কুলাতো তিনি তাদের দুঃখ বেদনা দূর করবার জন্য তাই করতেন।

অনুচ্ছেদ– ৬
বাবার শেষ দিনগুলো

বাবা যখণ প্রথম হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-এর কাছে বয়আত করেন তখন তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, আইন ব্যবসা করতে গিয়ে কখনো কখনো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে উচ্চস্তরের নৈতিকতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই তিনি উপদেশ চেয়েছিলেন যে, তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করে নিজের জীবন উৎসর্গ করে এই আন্দোলনের কাজ করতে চান। তখন তাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল আইন ব্যবসা চালিয়ে যেতে, তবে ধৈর্য্য ও ঐকান্তিক দোয়ার সাথে সর্বদা সৎপথের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে, দান খয়রাত করতে ও পেশাদারী সততা ও বিশ্বস্ততার উজ্জ্বল উদাহরণ হওয়ার চেষ্টা করতে। তখন থেকে প্রত্যেক ব্যাপারেই তিনি সেই উপদেশ অনুসারে চলার চেষ্টা করতেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-এর ইন্তেকালের পর প্রথম খলীফার কাছেও তিনি এই ব্যাপারে আবার উপদেশ চান। তিনিও তাকে একই উপদেশ দিলেন। তবে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে তাকে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার পরামর্শ দিলেন। সেই বয়সেই তিনি এই অসাধ্য সাধন করেন এবং যখন প্রথম খলীফাতুল মসীহর কাছে খবরটি জানালেন তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে ঘোষণা করলেন, দেখুন! নসরুল্লাহ খান আমার ভালবাসা অর্জনের জন্য এত আগ্রহী যে তিনি আমার প্রিয়তমকে (কুরআন শরীফ) তার হৃদয়ে বসিয়ে ফেলেছেন।'

দ্বিতীয় খলীফার খেলাফতের প্রথম দিকে তিনি বাবাকে পরামর্শ দিলেন, তার এখন জীবন উৎসর্গ করে জামাআতের খেদমতে নিজেকে পেশ করার সময় এসেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই নসীহত অনুসারে কাজ করলেন, যার জন্য তিনি এত দিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন। নিজের আইন ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে তিনি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাদিয়ানে চলে যান এবং জামাআতের খেদমতে নিজেকে পেশ করে দেন।

তাকে খলীফাতুল মসীহের চীফ সেক্রেটারী করা হয় এবং বেহেশতি মাকবেরা কবরস্থানের (যেখানে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ:) এবং তাঁর নিকটতম শিষ্য ও অন্যান্য জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিবর্গ সমাহিত আছেন ও পরবর্তীকালে সমাহিত হবেন) পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাতের বেলা তিনি মসীহ মাওউদ (আ:)-এর গ্রন্থাবলীর সূচী তেরী করতেন। এ সবই ছিল প্রেমের খাতিরে পরিশ্রম। এর একমাত্র ফল তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির মাঝেই তালাশ করতেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে বাবা মা দু'জনেই হজ্জ করতে যান। বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য মিয়া জুম্মনকেও সঙ্গে নেওয়া হয়। যাওয়া ও আসার সময় দু'টি মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সময় ছিল। বাবা 'সীসিকনেসে' বেশ কষ্ট করেন। কিন্তু মা জাহাজে চড়াটা বেশ উপভোগ করেন। সেই বৎসরে মীনা ও আরাফাতে পানির বড় অভাব দেখা দিয়েছিল। হাজীদের নিদারুন কষ্ট গিয়েছিল। হাজার হাজার হাজী তৃষ্ণায় মৃত্যু বরণ করেছিল। এই সংবাদে আমি অত্যন্ত কাঁতর হয়ে পড়ি। তবে তাদের নিরাপদে দেশে ফেরাতে স্বস্তি পাই।

মা যাওয়ার সময় নিজেদের কাফনের কাপড় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সেগুলো জমজমের পানি দিয়ে ধূয়ে এনেছিলেন। এই কাফনের কাপড় অবশ্য বাবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল আরো দু'বৎসর পর, আর মা'র নিজের জন্য বার বৎসর পর। হজ্জের এই সফরের পর বাবার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভেঙ্গে পড়ে।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের আগষ্ট মাসে বাবা-মা ও আমি কাশ্মীর বেড়াতে যাবো বলে ঠিক করি। চৌধুরী বশির আহমদ আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। আমরা মারীতে স্বল্প যাত্রা বিরতি করি। কিন্তু বাবা সেখানে মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মা ও বশির আহমদ অক্লান্ত সেবা যত্ন করে তাকে ভাল করে তোলেন। বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি মোটামুটি ভাল হয়ে উঠেন এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আমরা আবার কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। বৎসরের সেই সময়টাতে এই বিশ্ববিখ্যাত উপত্যকা তার সবচেয়ে মনোরম অবস্থায় ছিল। তাই আমাদের জন্য সেটা ছিল পরম আনন্দদায়ক। আমরা সেখানে ১৫ দিন ছিলাম।

১৯২৬ সালের জুলাই মাসে আমাকে শিয়ালকোর্ট যেতে হয়। শিয়ালকোর্টের প্রধান আহমদীয়া মসজিদ নিয়ে জামাআতের বিরুদ্ধবাদীরা একটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করে। সেই মামলায় জামাআতের উকিল হিসাবে আমাকেই যেতে হয়। বাবাকেও শিয়ালকোর্ট আসতে হয় একজন সাক্ষীদাতা হিসাবে। তাকে অনেকটা দূর্বল দেখাচ্ছিল। তিনি জানালেন কাশির কারণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এই কেসের বাদীরা যখন বুঝতে পারলো যে মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে তারা যে কেস সাজিয়েছে, শেষ পর্যন্ত সেই তাসের ঘর তাদের উপরই ভেঙ্গে পড়তে পারে। তখন তারা আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করে। আমি লাহোর ফিরে আসি। বাবা কাদিয়ান ফিরে যাওয়ার আগে কয়েক দিনের জন্য আমাদের পৈত্রিক নিবাস দাস্‌কা যাবেন বলে ঠিক করেন।

আগষ্টের দুই তারিখে আমি জানতে পারি যে, বাবা দাস্‌কায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি দাস্‌কায় চলে আসি। তারপর বাবা ও মাকে লাহোর নিয়ে আসি। তার অসুখটি ছিল ফুসফুসের নীচে পানি জমা। পরদিন সেই পনি

বের করা হয়। এতে তিনি খুবই আরাম বোধ করেন এবং অনেকটা ভালর দিকে আসেন। ডাক্তারী ব্যাপারে বাবার বেশ জ্ঞান ছিল। তাই তিনি তার নিজের অবস্থার গুরুত্ব বুঝেছিলেন। দুই তিন দিন পর তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'হায়াত মওত আল্লাহর হাতে। আমার এখন কিছুটা ভাল মনে হচ্ছে। আল্লাহ চাইলে আমি হয়তো ভাল হয়ে যাব। কিন্তু আমার বয়সতো অনেক হয়েছে, তাই তোমাকে কয়েকটা ব্যাপারে কিছু বলে যেতে চাই। সম্পত্তির ব্যাপারে তিনি বেশ কয়েক বৎসর আগেই তার ওসিয়্যত করে ছিলেন। এখন তিনি আমাকে ঘরোয়াভাবে কয়েকটি ব্যাপারে বললেন। তার মধ্যে একটি ছিল তার জানাজার ব্যাপার। তিনি আমাকে অনুরোধ জানালেন যেন তার জানাজার নামাজ খলীফাতুল মসীহ পড়ান। খলীফাতুল মসীহ তখন ডালহৌসীতে ছিলেন। এরপর বাবা আর কোন ব্যাপারে উদ্বেগ দেখালেন না। তার শরীর দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তিনি নিজে খেতে-পড়তে ও হাটা-চলা করতে পারতেন। এক দিন আমি বাবাকে জানালাম যে খলীফাতুল মসীহ আমাকে ডালহৌসীতে বেড়াতে যেতে বলেছেন। তার আগে আমি কোন দিন ডালহৌসী যাইনি। বাবা খুব আনন্দিত হয়ে বললেন, 'তাহলে তো খুব ভাল, আমরা সবাই তাহলে চল ডালহৌসী যাই'। মা মন্তব্য করলেন,'আপনার শরীরের খবর জানা আছে?' বাবা উত্তরে বললেন, আল্লাহ আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিতেও তো পারে।'

মাসের শেষ দিকে বাবা ফুসফুসে আবার চাপ অনুভব করতে লাগলেন। যে ডাক্তার বাবাকে সব সময় চিকিৎসা করতেন তিনি কোন প্রয়োজনে তখন লাহোরের বাইরে ছিলেন। তারই মনোনীত অন্য একজন সুযোগ্য ডাক্তার আব্বাকে দেখে বললো, তার ফুসফুসের নীচে আবার পানি এসেছে। সেটা বের করে নিতে হবে। বাবা কিছুটা অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আমার ও মা'র পরামর্শে রাজী হলেন। পরদিন ২৯শে আগস্ট ডাক্তার তার একজন সহকারী নিয়ে এসে বাবার ফুসফুসের নীচে থেকে পানি বের করে নিলেন। মা সারাক্ষণ পাশের রুমে গিয়ে দোয়ায় রত ছিলেন। অপারেশন শেষ হলে মাকে খবর দেয়া হলো। মা যখন বাবার ঘরে ঢুকছেন এপ্রন পরা ডাক্তার ও তার সহযোগী তখন অন্যদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মা তাদের পিছন দিকটা দেখতে পেয়ে আতকে উঠে বলে উঠলেন, 'আল্লাহ আমাদের প্রতি করুণা কর'। তারপর আমাকে তার একটি স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যা তিনি বেশ কয় দিন আগে আমাকে শুনিয়েছিলেন। তাতে তিনি দেখে ছিলেন যে দু'জন ইউরোপীয় পোষাক পরা ব্যক্তি পেছনের কামরা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের দিকে ইশরা করে কেউ যেন মাকে বলছে 'ঐ দু'জনই চৌধুরী সাহেব (আমার পিতা চৌধুরী মোহাম্মদ নসুরুল্লাহ) কে

হত্যা করেছে'। মা জানালেন স্বপ্নে তিনি ঐ দু'জনের পিছন দিক যে রকম দেখেছিলেন আজ যে দু'জন ডাক্তারকে দেখলেন তাদেরও সম্পূর্ণ ঐ রকম দেখা গেল।

অপারেশনের পর বাবা কিছুটা আরামবোধ করলেন। কিন্তু বিকালের দিকে তিনি আবার শ্বাসকষ্ট ও ব্যথাবোধ করতে লাগলেন। ৩০ তারিখ সকালে তার ব্যথা সম্পূর্ণ সেরে গেল, কিন্তু শ্বাসকষ্ট তেমনি রইল বরং আরো অনিয়মিত হলো। তিনি বুঝেছিলেন যে অসুস্থতার শেষ প্রান্ত সীমায় চলে এসেছেন, কিন্তু কোন উদ্বিগ্নতা বা ব্যাকুলতা দেখাতেন না। যা যা ঔষধাদী ও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হলো সব তিনি ঠিকমত খেতেন ও মেনে চলতেন। মঙ্গলবার ৩১ শে অগষ্ট খুব ভোরে তাকে রেখে আমি পাশের ঘরে ফজর নামাজ পড়তে গেলাম। তিনি পাশের রুম থেকে নামাজে আমার কান্নার আওয়াজ শুনে মাকে পাঠিয়ে দিলেন যাতে আমাকে আশ্বস্ত করা হয়। আমার নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মা দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আমাকে ধৈর্য্য ধরতে উপদেশ দিলেন, আরো বললেন যে বাবা বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করবেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কোন স্বপ্ন দেখেছেন কিনা। জবাবে মা জানালেন যে, হ্যাঁ, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, বাবা যেন কোন কিছু লিখতে ব্যস্ত। ঘরে একজন কম বয়সী মহিলা সোফার উপর বসে আছেন। সুকরুল্লাহ খান (আমার ভাই) তোমার বাবাকে বলছে 'জনাব আপনি যখণ যাচ্ছেন তখন সাথে এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে যান,' তাতে তোমার বাবা বলছে, 'পুত্র, আমি শুক্রবারে রিলিজ হবো। তার এই 'রিলিজ' শব্দ দিয়ে মনে হচ্ছে শুক্রবার শুরু হওয়ার পরই তিনি ইহধাম ত্যাগ করবেন। কাজেই ডাক্তাররা যাই বলুক তোমাকে আল্লাহর ইচ্ছা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ধৈর্য্যশীল হতে হবে। এখন থেকে আয়োজন শূরু করো যেন তার দেহকে শুক্রবার সকালের মধ্যে কাদিয়ান পৌঁছানো যায় (যাতে খলীফাতুল মসীহ তার জানাজা পড়াতে পারেন) ও তাকে সেখানে দাফন করা যায়। দাস্কায় তোমার ভাইদের কাছে খবর পৌঁছানো দরকার যাতে ওরা দু'জন তাড়াতাড়ি চলে আসে, সঙ্গে করে যেন তোমার বাবার কাফনের কাপড়টা নিয়ে আসে, আর তৃতীয় জন যেন তোমার বোনকে আনার জন্য চলে যায়। খবরে তাদের বলে দিও যেন সবাই অবশ্যই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার আগেই এখানে পৌঁছায়। তাদের বলে দিও এই খবর যেন নিজেদের মধ্যেই গোপন রাখে, না হলে প্রত্যেকেই (প্রত্যেক আত্মিয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা) লাহোর চলে আসবে।

এরপর মা আমাকে বললেন যেন একটি কফিন তৈরীর জন্য আমি কাউকে বলি যাতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার আগে সেটা তৈরী হয়ে যায়। আরো বললেন, গাড়ী যেন এভাবে ঠিক করি যাতে বৃহস্পতিবার দিনগত রাত দু'টায় কাদিয়ান রওনা হওয়া যায়।

সামান্য একটু শ্বাসকষ্ট ছাড়া বাবার কোন অসুবিধা দেখা যাচ্ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন। সবদিকে খেয়াল ছিল, আমাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলছিলেন। শুধুমাত্র তিনি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। বুধবার ১লা সেপ্টেম্বর আমি তখন বাবার ঘরে একা। তাকে বললাম, 'বাবা আমার বিশ্বাস তুমি একাকিত্ব বোধ করবে না। আমাদের বিচ্ছেদ দীর্ঘ হবে না। আমরা আবার একসাথে হবো। তিনি বললেন, 'আমার প্রভূ আমাকে নিয়ে যাই করেন, আমি তাতেই সন্তুষ্ট।'

সন্ধ্যায় মা আমাকে কুরআন শরীফের ৩৬তম সূরাটি বাবাকে পড়ে শুনাতে বললেন। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি শুনতে চান কিনা। তিনি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন। আমি তেলাওয়াত শেষ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি আর কোন সূরা শুনতে চান কি না। 'মনোযোগ দিয়ে শুনতে আমার কষ্ট হচ্ছে'– তিনি জবাব দিলেন।

সে দিনই বেশ কিছু পরে আমার ছোট দুই ভাই সুকরুল্লাহ খান ও আসাদুল্লাহ খান এবং আরো কিছু আত্মীয় এসে উপস্থিত হলো। বৃহস্পতিবার ২রা সেপ্টেম্বর তার শ্বাস-প্রশ্বাস পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি বেশ দূর্বল হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ছিলেন। মাঝে মাঝে একটু একটু ঢুলছিলেন। তিনি মাকে ডেকে বললেন, তিনি পুরোপুরি স্বস্তিতে আছেন, আর যখনি ঢুলছেন তখন দেখছেন যে সারা ঘর ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে, তার সুগন্ধে ঘর মৌ মৌ করছে। ডাক্তার তাকে মাঝে মাঝে ইঞ্জেকশন দিচ্ছিলেন যাতে তার হার্ট শক্তি ফিরে পায়। তিনি বাধা দিলেন না, যদিও তিনি বুঝতে পারছিলেন এর কোন প্রয়োজন নেই। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, 'এই রকম অবস্থা কেউ এড়াতে পারবে না।'

রেলের অডিটর বাবু আব্দুল হামিদকে আমি বিভিন্ন ব্যবস্থাদি করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি সন্ধ্যার বেশ পরে আমাকে জানালেন যে, কফিন প্রস্তুত করা হয়েছে, গাড়ীও ঠিক রাত দু'টায় আসবে। আমাকে তিনি বাবার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাকে বললাম আপনি ডাকার সময় আমি বাবার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

আমার ভাই আব্দুল্লাহ খান আমার বোনকে নিয়ে আসলো। সে বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাবার হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে রইল। বাবা হাতটা টেনে নিয়ে আমার হাটুর উপর রাখলেন, তাকে বললেন, 'বাপজান, আমার হাতটা এখানে থাকলে আমার ভাল লাগে।'

মা'র স্বপ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমি জানতাম বাবার সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমার মনটাও তার স্পর্শ ছাড়া থাকতে চাইছিল না। তার কানে কানে আমি বললাম; 'বাবা আমি যদি তোমার কষ্টটা নিজে বহন করতে পারতাম'। বাবার হাতটা আমার ঘাড় বেষ্টন করে ধরে আমাকে তার মুখের কাছে টেনে নিলেন, তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'তোমার এই ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুরুপ নয়, প্রত্যেকের তার নিজের সময় আসবে'।

কয়েক মিনিট পরে আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম; 'বাবা তোমার কি মনে আছে কে এই কথাটা বলেছিল, 'তুমি ছিলে আমার চোখের মনি– আর এখন আমার চোখ অন্ধ। তুমিই যখন নেই, এখন যে কেউ মারা যাক তাতে আমি শঙ্কিত নই। আমি তো শুধুমাত্র তোমার মৃত্যুর ব্যাপারেই ভীত ছিলাম'। তিনি উত্তরে বললেন, 'রসূলুল্লাহর (সা:) ব্যাপারে হাসান বিন সাবেদ বলেছিল। রাতের খাবারের সময় হলো, কেউ খেতে চাচ্ছিল না। বাবা কিন্তু তাগাদা দিলেন কাজের লোকদের যেন বেশীক্ষণ বসিয়ে রাখা না হয়। মেহমানদের নিয়ে আমিই খাবার টেবিলে গেলাম। কিন্তু কয়েক মিনিট পর বাবার কাছে ফিরে এলাম। ভ্যাপসা গরম লাগছিল। মা বাবার খাটটি বড় বাগানে নিয়ে যেতে বললেন, যাতে একটু খোলা বাতাস পাওয়া যায়। আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনিও রাজী হলেন। আমি খাটটি ধরাধরি করে বাইরে নেওয়ার জন্য অন্যদের নির্দেশ দিলাম। তারপর আবার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম; 'আপনি কি বাগানে থাকতে চান? উত্তর দিলেন মা; 'তিনি আর নেই'– বলেই তিনি **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'** পড়লেন। তারপর 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পড়লেন। তারপর দোওয়া করলেন, 'হে আল্লাহ এই আত্মাকে তুমি তোমার অশেষ করুণায় গ্রহণ কর, প্রতিশ্রুত মসীহের শিষ্য হিসাবে রসূলুল্লাহর পদতলে তার স্থান দাও।

মৃতের সৎকারের ব্যবস্থাপনা শেষ করে আমি কয়েকবারই চুপে চুপে মা'র ঘরে গেলাম, এই প্রচন্ড শোকের দিনে তার অবস্থা দেখবার জন্য। তিনি আরো মহিলাদের মাঝে বসেছিলেন শান্ত হয়ে, বাবার অসুখের ধারাবাহিক অবস্থা তাদের কাছে বর্ণনা করছিলেন। তারপর জানাজার নামাজ হলো, অন্যান্য মেয়েদের সাথে তিনিও জানাজায় শরীক হলেন। তারপর কফিনটি যখন গাড়ীতে তোলা হবে আমি মাকে ধরে এগিয়ে গেলাম। মা বিদায় জানালেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহর হাতে সপে দিলাম। সারা জীবন তুমি আমাকে সুখে রেখেছিলে, আমার সর্বশেষ ইচ্ছাও অপূর্ণ রাখনি। আমার হৃদয় তোমার প্রতি সবসময় সন্তুষ্ট ছিল। এমন ঘটনা আমার মনে পড়ে না যে আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম, আর তা যদি কখনো হয়ে থাকে তবে আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তোমাকে মাফ করে দিচ্ছি।

আমার দিক থেকে তো অনেক ভুল ভ্রান্তি ছিল। তার জন্য এখন আমি আল্লাহর কাছেই ক্ষমা চাই। আল্লাহ তাআলা তার আপন করুণায় তোমাকে গ্রহণ করুন, তোমার পিতাকেও আমার শুভেচ্ছা জানিও। যদি সম্ভব হয় তোমার অবস্থা আমাকে জানিও'।

শেষের ক'টি কথা হয়তো তার অজান্তেই বের হয়েছিল, তাছাড়া শুধুমাত্র অপরিসীম ধৈর্যের সাথেই নয় বরং হাসিমুখে। তিনি খোদা তাআলার ইচ্ছাকে গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্তমূলক প্রায় অর্ধ শতাব্দী বিস্তৃত তার দাম্পত্য জীবনের পরম ভালবাসার জনের এই চির-বিচ্ছেদের দিনেও তিনি তার শোককে প্রকাশ হতে দিলেন না। তার হৃদয়ের মর্মবেদনা শুধুমাত্র তিনি জানতেন, তা ছিল একান্তই তার পবিত্র গোপন ব্যাপার । এ ব্যথার কথা কাউকে প্রকাশ করার মত বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করতে পারেন না। আল্লাহই ছিলেন তার একমাত্র বিশ্বাসভাজন ও সান্ত্বনা। তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

তাঁর চীফ সেক্রেটারীর ইন্তেকালের সংবাদ দিয়ে খলীফাতুল মসীহকে ডালহৌসীতে টেলিগ্রাম করা হলো।

ভোরের অনেক আগে আমরা কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে লাহোর ত্যাগ করি। পবিত্র দেহাবশেষ নিয়ে সূর্যোদয়ের কিছু পর (৩রা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার) আমরা কাদিয়ান পৌঁছাই। খলীফাতুল মসীহ সংবাদ পাঠালেন যে তিনি আসছেন, তিনি নিজে জানাজা পড়াবেন। তখন প্রচন্ড বৃষ্টি থাকায় তিনি ও তার সহযাত্রীরা মাঝরাতের পর কাদিয়ান পৌঁছেন। শনিবার সকাল নয়টায় তিনি জানাজা পড়ান ও দাফনের অনুমতি দেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের জন্য রক্ষিত স্থানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-এর কবরের পশ্চিম দিকে তাকে দাফন করা হয়। যেই তাকে দাফন করা শেষ হলো অমনি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে তার কবরের উপরটা লেপে দিতে কোন অসুবিধা হলো না।

খলীফাতুল মসীহ নিজেই তার 'কতবায়' (কবরের পার্শ্বে মৃতের সম্বন্ধে পরিচয় জ্ঞাপক ফলক) নিম্নোক্ত বিবরণ লিখে দিতে বললেন, 'আল্লাহর নামে যিনি রহমান ও রহিম। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তার রসূল (সা:)-এর উপর দরুদ এবং তার প্রতিশ্রুত মসীহের প্রতিও শান্তি।'

শিয়ালকোটের চৌধুরী নসরুল্লাহ খান উকিল, প্রতিশ্রুত মসীহের বয়আত গ্রহণ করেন ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে, যখন মসীহ মাওউদ (আ:) শিয়ালকোটে সফরে ছিলেন। যদিও তাঁর প্রতি তিনি অনেক আগে থেকেই আকৃষ্ট ছিলেন, তার স্ত্রী স্বপ্নের ভিত্তিতে তার আগেই জামাআতে যোগদান করেন। তিনি অত্যন্ত মহৎপ্রাণ, আন্ত

রিক ও আধ্যাত্মিক লোক ছিলেন। আল্লাহ ভক্তিতে তিনি দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন। অত্যন্ত বেশী বয়সেও তিনি পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে আমার পরামর্শে তিনি তাঁর জাঁকালো আইন ব্যবসা গুটিয়ে ধর্মের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। এই রকম উৎসাহ নিয়ে তিনি কাদিয়ানে এসে বসতি স্থাপন করেন। আমি তাকে আমার চীফ সেক্রেটারী নিযুক্ত করি, যার দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে করতেন। একই সময়ে তিনি হজ্জও পালন করেন। আল্লাহর সন্তোষ অন্বেষণই তার কাজের হেতু হতো। আমার শুভেচ্ছা তার কাম্য ছিল। আহমদী ভ্রাতাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি তার কাজ ছিল। যেহেতু আমার খুব কাছে থেকে তিনি কাজ করতেন, তাই আমি তাকে দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ও অতি ক্ষীণ ঈশারা ধরার মত তীক্ষ্ম ধী'সম্পন্ন পেয়েছিলাম। তিনি এত শুভ ইচ্ছা সহকারে কাজ করতেন যে তার জন্য আমার হৃদয়ে ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা ভরা থাকতো। তার কথা স্মরণ হলে আমার মন ভরে যায়। আমি তার জন্য দোওয়া করি আল্লাহ যেন তাকে উচ্চ দরওয়াজা দান করেন এবং তার সন্তানদেরকেও যেন একই উদ্দীপনা ও আগ্রহ নিয়ে অগ্রসর ও উন্নতি লাভের সুযোগ দেন এবং তার মত নিবেদিতপ্রাণ পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করার সৌভাগ্য এই জামাআতের অনেককেই দান করেন।

৫ তারিখে বিকালে আমরা কাদিয়ান থেকে দাস্কায় ফিরে আসি, মা আমাকে বলেছিলেন, আমরা যেন জোহরের নামাজের সময় দাস্কায় এসে পৌছাই, যাতে তিনি নিজেকে নামাজে ও দোয়ায় নিয়োজিত করে ফেলতে পারেন। এতে করে একটি সুবিধা হবে এই যে, যে সমস্ত মহিলারা শোক জানাতে আসবে তারা কোন রকম বেদাতী ক্রিয়াকর্ম প্রদর্শনের সুযোগ পাবে না। আহমদীয়া জামাআতে বয়আত গ্রহণ করেননি এরকম একজন মহিলা মা'কে বললেন, গতকাল তিনি প্রচন্ড জ্বরে বেহুস হয়ে যান। সেই অবস্থায় তিনি দেখেন যে আমাদের বাড়ীর পুরানো কাজের লোক মিয়া জুম্মন যেন তাকে বলছে, 'চলুন আপনাকে কাদিয়ান নিয়ে যাই'। তিনি যেন মিয়া জুম্মনের সঙ্গে রওনা হলেন। তারপর মিয়া জুম্মন সামনের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ যে কাদিয়ান দেখা যায়'। তখন তারা একটি বড় বাগানে ঢুকলো। তাতে একটি প্রাসাদোপম বাড়ী যার সামনের দিকের একটি কামরায় বসে আমার বাবা কুরআন তেলাওয়াত করছেন, আর একজন সুন্দরী যুবতী তাকে পাখা দুলিয়ে বাতাস করছে। ঘরে সব ধরনের ফল রাখা আছে। বাবা যেন তাদের বসতে বললেন, তারপর মহিলাকে বললেন, জাফরুল্লাহ খানের মা'কে বলবেন যে, আমি খুব সুখেই আছি। এর পর পরই তিনি জ্ঞান ফিরে পান এবং দেখেন, তার জ্বর ভাল হয়ে গেছে।

মা'তো এ কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, কিন্তু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, স্বপ্নে দেখা ঐ যুবতী মহিলার তাৎপর্য কি। মা নিজের স্বপ্নেও ঐ যুবতী মহিলাকে বাবার সঙ্গে দেখেছিলেন। এখন আবার এই মহিলাও তাই দেখেলো।

পর দিনই মা'র এক বোন তাকে দেখতে এলো। তিনিও প্রায় একই রকম একটি স্বপ্নের কথা মাকে শোনালো। শুধুমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে এক্ষেত্রে বাবা তাকে বলেছিলেন, 'তোমার বোনকে বলো আমি খুব সুখে আছি, আর এই যুবতী মহিলাকে শুধুমাত্র আমার খেদমতের জন্যই নিযুক্ত করা হয়েছ'।

অনুচ্ছেদ- ৭
আমার বাসায় মায়ের আবাস

বাবা মারা যাওয়ার আগে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে মা যেন আমার সঙ্গে থাকেন। তার শেষ অসুখের সময়ও তিনি মাকে একথা বলেন। মা'রও এই রকমই ইচ্ছা ছিল। আমার পক্ষ থেকে আমি বলতে পারি যে এর অন্যথা অন্য কোন ব্যবস্থা হতে পারে সে রকম আমি ভাবতেও পারতাম না। আমরা এত কাছা-কাছি ছিলাম যে বাবার মৃত্যুর পর এই নৈকট্য ও বন্ধন আরো গাঢ় হয়েছিল। আমি ভাবতাম মা'র শেষ দিনগুলোতে তার কাছা-কাছি থাকায়, তাকে সেবা করার পরম সৌভাগ্য আমারই হবে। আমার স্ত্রীও তার প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল। তাদের সম্পর্কের মধ্যে নুন্যতম কোন ফাঁক আছে এটা কখনো দেখা যায় নি। আমার ছোট ভাইয়েরাও চিরকাল থেকে দেখে এসেছে যে আমার সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, মা আমার কাছে থাকতে পারলেই বেশী খুশী থাকেন। তাদের পক্ষ থেকে এজন্য কখনো কোন ঈর্ষা বোধ ছিল না। মা প্রায়ই তাদের বাড়ীতে যেতেন। যখনই যেতেন তাকে খুব সাদরে আগ্রহ ও আনন্দের সাথে সম্বর্ধনা জানানো হতো। তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরাও যখনই মার কাছে আসতো মা সানন্দে তাদের বরণ করে নিতেন। আল্লাহ্‌র ফজলে এই ব্যবস্থা খুব ভাল প্রমাণিত হয়েছিল।

সেই সময়ে লাহোরের অদূরে নতুন গড়ে উঠা 'মডেল টাউনে' আমি একটি বাড়ী তৈরী করি। তাতে মা'র জন্য আলাদা রুম ও বাথরুম ছিল। শহরে আমার যে অফিস ছিল প্রায় সারাদিন আমাকে সেখানে থাকতে হতো। তবু আমি নিয়ম করে নিয়েছিলাম যে ঘরে ফিরে আমি মায়ের সাথে সন্ধ্যার পর কিছু সময় কাটাতাম। কখনো যদি কোন কারণে শহরে আটকে যেতাম এবং ঘরে ফিরতে দেরী হয়ে যেতো, তবুও অবশ্যই কিছু সময় মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে আসতাম। কয়েক বছর পর আমার ছোট ভাই আসাদুল্লাহ খান ব্যারিস্টার হিসাবে পাশ করে আসে এবং আমার জুনিয়র হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। শহরে আমার অফিসের উপরের এপার্টমেন্টে সে বাসা করে নেয়। মা'র জন্যও এটা খুব ভাল বোধ হলো। সকালে আমার সাথে মা চলে আসতেন। আমি অফিসে, মা আসাদুল্লাহর বাসায় দিন কাটিয়ে বিকালে আমার সাথেই ফিরে আসতেন। এতে করে মা অনুভব করলেন যে তিনি বেশী সময় আমার কাছাকাছি থাকতে পারছেন। মা আমাকে বলতেন যে জানালা দিয়ে তিনি আমাকে যখনই কোর্টে ঢুকতে দেখতেন তখনই দোয়া করতে শুরু করে দিতেন যেন আমি কেসে জিতে বিজয়ীর বেশে সম্মান নিয়ে ফিরে আসতে পারি। আমার কাজের ব্যাপারে তার বেশ উৎসাহ ছিল। প্রায়ই তিনি আমাকে বলতেন, আমাকে যারা উকিল নিযুক্ত করে তারা স্বাভাবিক ভাবেই

তাকেও তাদের দয়াদ্রি হিসাবে পেয়ে যায়। এভাবে তারা তার শুভেচ্ছায় অংশীদার হয়ে যেতেন। আমার কোন সন্দেহ নাই যে মায়ের দোয়ার ফলেই আমি আমার পেশায় অত্যন্ত দ্রুত উন্নতি করি।

তাকে আমাদের মাঝে পাওয়া ছিল একটি আশীর্বাদ। ভেদাভেদ না করে তিনি সবাইকে তার শুভেচ্ছা বিতরণ করতেন। তার স্বর্গীয় উপস্থিতিতে আমার বাড়ীর ঔজ্জল্য বেড়ে গিয়েছিল। আমরা যারা তার কাছা-কাছি থাকতাম, সব সময়ই তার দোয়ার ফলে উপকৃত হতাম। তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী, তার হৃদয় ছিল খুব স্পর্শকাতর। আমার যে কোন ভুল ত্রুটি তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দিতেন, আবার আমার জন্য দোয়া করে তার জন্য পুরষ্কারের ব্যবস্থা করতেন। এটা মা'র একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যারা মা'র সংস্পর্শে এসেছে তারাই এ কথার সত্যতা ভালভাবে জানেন। পুরষ্কার ও দান করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সবার আগে।

একবার তিনি আমাকে বললেন, তিনি চিন্তা করে পান না আমি কেন তার এত বাধ্য, আর তার অতি সামান্য ইচ্ছাকেও পূর্ণ করার ব্যাপারে এত ব্যাগ্র হয়ে পড়ি। তিনি আমার কাছ থেকে উত্তর আশা করছিলেন। আমি বললাম, 'প্রথমত: এই জন্য যে, আপনি আমার মা, আল্লাহ্ আপনার কথা শোনা আমার জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। দ্বিতীয়ত: আপনার অপরিসীম ভালবাসা, তৃতীয়ত: আমার আশা আছে, আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি যখন আব্বার সাথে মিলিত হবেন তখন তাকে বলতে পারবেন যে, আমি পূর্ণভাবে আপনার অনুগত ছিলাম এবং আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট। মা তার হাতটা বুকের উপর রেখে বললেন, যে তিনি অবশ্যই তা করবেন।

একটা ব্যাপারে মা খুবই কড়া ও আপোষহীন ছিলেন। সেটা ছিল ধর্মগত ব্যাপারে তার উদ্দীপনা ও বিশ্বস্ততা। এক বৃদ্ধ সুফী সাহেবের নিকট একবার বাবা কিছুদিন মৌলানা রুমীর 'মসনবী' পড়েছিলেন। সেই বৃদ্ধ সুফী সপ্তাহে দু'একবার আমাদের বাড়ী আসতেন। একবার তিনি বাড়ী এসে দেখেন, বাবা বাড়ী নাই। কাজের লোকটি তাকে জানালো বাবা কাদিয়ান গিয়েছেন। এতে তিনি চটে গিয়ে আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাকে গালাগালি দিয়ে বসলো। মা তার কথা শুনতে পেরেছিলেন। কাজের লোকটিকে ডেকে তিনি বললেন, বৃদ্ধকে যেন এ বাড়ীতে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়।

বাবার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরেই আমি 'পাঞ্জাব বিধান সভার' সদস্য নির্বাচিত হই। এটা ছিল আমার জন্য জনসেবার প্রথম সোপান। স্যার ফজল-ই-হাসান ছিলেন পরিষদের নেতা। তিনিও একজন 'ব্যারিস্টার এট ল' ছিলেন। শিয়ালকোর্টে ওকালতি শুরু করেছিলেন, তাই বাবাকে ভালভাবে চিনতেন এবং খুব শ্রদ্ধাও করতেন।

যখন আমি বিলাতে পড়াশুনা করতে যাই তখন তিনিই আমাকে পরিচয় জ্ঞাপক চিঠি দিয়েছিলেন। দেশে ফেরার পরও তিনি চীফ কোর্টে আমার এ্যাডভোকেট হিসাবে এনরোলমেন্ট এর ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন ল' কলেজ কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন তখন ইউনিভার্সিটি ল' কলেজে পার্ট-টাইম লেকচারার হিসাবে আমার জন্য একটি নিযক্তি পত্রও তিনি যোগাড় করে ফেলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং তিনি যে পাঁচ বছর মন্ত্রী ছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে পাঞ্জাবের জনগণের প্রচুর ও দীর্ঘ স্থায়ী উপকার করেছিলেন। পরে তিনি রাজস্ব সদস্য হন। আমার বিধান পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় থেকেই তিনি আমার উপর আস্থা এনেছিলেন ও আমাকে তার প্রধান সহচর হিসাবে নিয়েছিলেন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে শুনা যাচ্ছিলো যে, ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য একটি রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করা হবে। পরবর্তী কালে এর নাম হয়েছিলো সাইমন কমিশন। এই কমিশন নিয়োগের প্রাক্কালে বিলাতের উচ্চ মহলে ভারতের মুসলমানদের দৃষ্টি ভঙ্গি জানানোর জন্য প্রধানত স্যার ফজলে হোসেনের পরামর্শেই বিধান সভার মুসলমান সদস্যগণ শরৎকালে আমাকে বিলাত পাঠালো। ছয় সপ্তাহ আমি লন্ডনে ছিলাম। আমাকে প্রদত্ত ম্যানডেট অনুসারে আমি প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ও তাদের বুঝাই। আমার নিজের জন্য এটা ছিল খুব বড় শিক্ষা। স্যার ফজলে হোসেন আমার রিপোর্ট পড়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

সে বৎসরই শুরুর দিকে মা ও স্ত্রীকে নিয়ে আমি আমার শ্বশুর চৌধুরী সামশাদ আলী খান আই, সি, এস, কে দেখতে যাই। তিনি তখন বিহারের গিরিধিতে সাব-ডিভিশনাল অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। প্রথম দিনই মা একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন আমার স্ত্রী যেন বাগানের একটি গাছ থেকে একটি ফল পাড়ার চেষ্টা করছেন। বাবা আমার স্ত্রীকে বলছেন, ফলটি তো এখনো পাকেনি, এই ফলের মৌসুম এলে তিনি নিজেই তার জন্য এক প্লেট ফল নিয়ে আসবেন। মা বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা ৯০০ মাইল ট্রেনে করে এখানে এসে পৌঁছেছি। আপনি এত তাড়াতাড়ি এখানে কিভাবে পৌঁছালেন? বাবা বললেন, 'আমি তোমার সাথে সাথেই এখানে এসেছি'।

চৌধুরী সামসাদ আলী খান নিজে অতিন্দ্রিয় ব্যাপারে চর্চা করতেন। এক দিন তিনি মাকে প্রস্তাব দিলেন মৃতের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের এক আসরে মা যেন এক সন্ধ্যায় তার সঙ্গে যোগ দেন। মৃতের আত্মা কারো খেয়াল খুশীর আজ্ঞাধীন এ কথা মা বিশ্বাস করেন না বলে চৌধুরী সাহেবকে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু চৌধুরী সাহেব তার সাধনা চালিয়ে গেলেন এবং কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মাকে জানালেন, তিনি এসে এখন তার স্বামীর আত্মার সাথে কথা বলতে পারেন।

একথা শুনে মা জবাব দিলেন; দয়া করে তাকে বলে দিন যে আল্লাহ্ তাকে যে অবস্থায় রেখেছেন ও যা করতে আদেশ করেছেন তাই যেন করেন। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেয়ে সেটাই তার জন্য উত্তম হবে।

মা বেড়াতে ভাল বাসতেন। প্রকৃতির শোভা দেখে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে খলীফাতুল মসীহ কাশ্মীর গিয়েছিলেন। ঝিলাম নদীতে নোঙ্গর করা নৌকায় তিনি ও তার সঙ্গীরা অবস্থান করছিলেন। হাইকোর্টের বন্ধের সময়ে আমরাও কাশ্মীরে বেড়াতে যাই এবং আমাদের হাউজবোর্টটি তার হাউজবোর্টের পাশেই নোঙর করা হলো। চৌধুরী শাহ নেওয়াজ ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

লেজিজলেটিভ কাউন্সিলের এক বিশেষ কমিটির সদস্য হিসাবে এর মিটিংয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমাকে চলে যেতে হয়। আমার এই অবর্তমানে তিন দিন ধরে বন্যায় নদীর পানি বিপদ সীমার কাছাকাছি উঠে যায়। তার মধ্যে একটি রাত ছিল সত্যিকার শঙ্কাজনক। আমি যখন ফিরে এলাম, মা আমাকে জানালেন, হযরত সাহেব ও তাঁর সহযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য তিনি সেদিন সারারাত দোয়ায় রত ছিলেন। এক পর্যায়ে সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদের নৌকার নোঙ্গর ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। শাহ নেওয়াজ সকাল সকাল ঘুমাতে গিয়েছিল। তাই মা এসবের মধ্যেও তার ঘুম ভাঙ্গালো না। সময় সময় মা তার কেবিনের দরজায় গিয়ে তার সুনিদ্রার ব্যাপারটি লক্ষ্য রাখতেন। তার জন্য মা দোয়া করতে শুরু করলেন, 'হে আল্লাহ্ বৃদ্ধ বয়সে তার পিতাকে তুমি এই সন্তান দিয়ে ছিলে। এ তোমার নিজ করুণায় তার প্রতি এক বিশেষ উপহার। এখন তুমিই তার হেফাজত করো। মা কিন্তু নিজের ব্যাপারে কোন ভয়ই পাননি বলে জানালেন। খলীফাতুল মসীহের সান্নিধ্যে তিনি বেশ নিরাপদ বোধ করেছিলেন।

কাশ্মীরে থাকার সময় একদিন জামাআতের উন্নতির ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল। আমি মাকে বললাম, আমি মানুষকে কত বোঝাই, যুক্তি প্রমাণ দেই, কিন্তু তেমন ফল হতে দেখি না, অথচ মা'র কাছে যিনিই আসতেন তিনি ঘনিষ্ট ভাবে আকৃষ্ট হয়ে যেতেন। এর ভেতর কি রহস্য রয়েছে তা মাকে বলতে অনুরোধ জানালাম। মা বললেন, 'তুমি তো জানই আমার কোন বই পুস্তকের লেখা পড়া জ্ঞান নেই। যদি কোন রহস্য থাকে তাহলে এটা হতে পারে যে, আমার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা আছে। আমি বুঝতে পারলাম, প্রকৃত পক্ষে সেটাই আসল শিক্ষা ও সত্যিকার শিক্ষা।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার ফজলে হোসেন গভর্ণর জেনারেল-এর কার্যকরী পরিষদের (এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের) সদস্য নিযুক্ত হন। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই এবং তার অভাব যে পাঞ্জাবে বিশেষভাবে অনুভূত হবে তাও বলি। উত্তরে তিনি জানান, এই প্রদেশ ছেড়ে যেতে আমি খুবই উৎসাহী ছিলাম না। দুটি ব্যাপারে

চিন্তা করে আমি তা করেছি। গভর্ণর জেনারেল (লর্ড আরউইন, পরবর্তীকালে লর্ড হ্যলিফাক্স) আমাকে এমনভাবে অনুরোধ করে বসলেন যে তাকে ফেরানো কঠিন হয়ে পড়লো। দ্বিতীয়তঃ এই প্রদেশের মন্ত্রীত্বে আমি তো দশ বৎসর ধরে আছি। আমি চলে গেলে যদিও একজনের ভাগ্যেই তা জুটবে তবু প্রত্যেকেই চাচ্ছিল আমি যেন চলে যাই। যখন একজন বাবা বৃদ্ধ হয়ে যায় তার সন্তানও চায় কবে বাবার ক্ষমতায় নিজে বসবে।

আমি প্রতিবাদ করে বলি, 'আমার বাবা আজ থেকে চার বৎসর আগে ইন্তেকাল করেছেন, অথচ প্রতি মুহূর্তেই আমি তার অভাব অনুভব করি।

মাথাটা সামান্য হেলিয়ে আশ্চর্য্য কণ্ঠে তিনি বললেন, তোমার পিতার মত পিতা খুব কম। তোমার মত সন্তানও খুব কম। আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আমি পাঞ্জাব বিধান সভায় পুনরায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হই। সেই সময়েই লন্ডনে রাজ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য একটি গোল টিবিল বৈঠক ডাকা হয়। বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমাকেও একজন প্রতিনিধি মনোনিত করা হয়। পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার জিওফ্লে-ডি-মন্টমরেন্সি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং তার মন্ত্রীসভার মন্ত্রীত্ব নিতে জোর করলেন। কিন্তু আমি তাকে জানালাম, আমি গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতেই পছন্দ করি।

সেন্টজেমস্ প্রাসাদে সেই কনফারেন্সের উদ্বোধনটি ছিল এক বিরাট জাঁকজমকের ব্যাপার। যদিও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল যোগ দিতে অস্বীকার করে তবু অন্যান্য রাজন্যবর্গ ও উৎহাসী দলগুলো এতে যোগ দিয়েছিলো। মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন, জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মৌলানা হোহাম্মদ আলী ও মৌলানা শওকত আলী), স্যার মোহাম্মদ সফি, তার কণ্যা বেগম শাহ নেওয়াজ, স্যার আহমদ সাঈদ খান, ছাত্রির নওয়াব, স্যার সৈয়দ সুলতান আহমদ, স্যার আব্দুল হালিম গজনভী, নওয়াব স্যার আব্দুল কাইয়ুম খান আরো অনেকে। পুরো মুসলিম প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহামান্য আগাখান। আমার জন্য এটা ছিল একটি বিশেষ সৌভাগ্য যে, এতগুলো বিশেষ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আগাখানের মত উজ্জ্বল ও জৌলুষপূর্ণ ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে– কাজ করাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তার কাছ থেকে পরবর্তীকালে অনেক অণুগ্রহও পেয়েছিলাম।

জুলাই ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই কনফারেন্স স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় আমাকে প্রধান রাজকীয় কৌশুলী নিয়োগ করা হয়। ফলে আমাকে দিল্লীতেই থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। আমরা তার সময়কে দাস্কা, লাহোর ও দিল্লীর মধ্যে ভাগ করে নিলেন।

অনুচ্ছেদ– ৮

স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে। আমাকে আবারও প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করা হয়। এদিকে ষড়যন্ত্র মামলার অগ্রগতি হচ্ছিল খুব ধীর গতিতে। ট্রাইবুন্যালের সতেরতম অধিবেশনে আমি প্রধান রাজ সাক্ষীকে জেরা করি। তারপর বিপক্ষ উকিল দীর্ঘ সময় ধরে তাকে জেরা করেন। ইতিমধ্যে আমি কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য বিলাত চলে যাই। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য গভর্ণর জেনারেল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে রাজী করাতে সক্ষম হলেন। মিঃ গান্ধীকে কংগ্রেস তাদের একমাত্র প্রতিনিধি মনোনীত করেন। ডিসেম্বরে কনফারেন্স স্থগিত হয়ে গেলে আমি দিল্লী ফিরে এসে দেখি তখনও রাজ সাক্ষীকে জেরা করা চলছে।

মা একটি স্বপ্নে দেখলেন যে স্যার ফজলে হোসেনের সবচেয়ে ছোট মেয়ে আস্‌ফ এর সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে। খলীফাতুল মসীহের কাছ থেকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জেনে নেওয়ার জন্য মা আমাকে অনুরোধ করলেন। তার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, আমি কোন গুরুতর দৈহিক আঘাত প্রাপ্ত হবো, পরে স্যার ফজলে হোসেন এর বিশেষ আনুকুল্যে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবো। ক্রীসমাসের সময়ে ট্রাইবুন্যাল এর কাজ বন্ধ থাকায় আমি মার সাথে থাকার জন্য লাহোরে চলে এলাম। নববর্ষের প্রথম দিনটিতে (১৯৩২), আমি যখন দিল্লী ফিরে আসার জন্য গাড়ীতে উঠার প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন মাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম, তিনি যেন চোখের জল লুকানোর চেষ্টা করছেন। আমি শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা কিসের জন্য এত চিন্তা করছেন?' তিনি স্লান হেসে বললেন, তোমার থেকে আলাদা হতে হচ্ছে বলে। আমি বললাম, তাহলে আমার সঙ্গে চলে আসুন। তিনি বললেন, না, কদিন পরে যাবো। মডেল টাউন ছেড়ে এসে লাহোরে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য একটু থামলাম। তার থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীর পেছনের দরজা খুলে উঠতে যাবো এমন সময় বন্ধুটি বলল, তুমি তো অনেক দূরে যাবে, তাই পেছনে না বসে সামনে বসলেই আরামে যেতে পারবে। সে নিজেই সামনের দরজাটা খুলে ধরলো। আমি ড্রাইভারের পাশে বসে পড়লাম। বেলা ১:৩০ মিনিটের দিকে 'করতারপুর' ও জলন্ধরের মাঝামাঝি স্থানে আমাদের সামনের কারটি হঠাৎ করে পাকা রাস্তা ছেড়ে মাটির রাস্তায় নেমে গেলো। ফলে চোখের পলকে ঘন ধুলোর মেঘের ভেতরে আমরা ঢুকে গেলাম ও একটি গরুর গাড়ীর

সাথে সামনা সামনি ধাক্কা খেলাম। একটি গরু সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। গাড়ীর রেডিয়েটর গুড়ো হয়ে যায়। গরুর গাড়ীর মাঝখানের অংশটুকু গাড়ির সামনের কাঁচ গুড়ো করে দিয়ে গাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়ে আমার বাম গালের দিকে আঘাত করলো। প্রচন্ড ধাক্কায় আমি হত চকিত হয়ে পড়ি। আমার বাম গালের মাংস ছিড়ে হাড় বের হয়ে যায়, কিন্তু চোখ নষ্ট হয়নি। নাকের হাড় ভেঙ্গে বেকে যায়, উপরের ঠোঁট কেটে ঝুলে পড়ে। আমার বেশ কটি দাঁত ভেঙ্গে পড়ে যায় ও প্রচুর রক্তপাত হয়। ড্রাইভার কিন্তু অক্ষত অবস্থায় বের হতে পেরেছিল। একটি লরিকে থামিয়ে তাতে করে আমাকে জলন্ধরের সিভিল হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে একজন সার্জন আমার ছেড়াফাড়া জায়গাগুলো সেলাই করে তাতে প্রয়োজনীয় ব্যান্ডেজ বেধে দিল। তার হাতের কাজ খুবই ভাল হয়েছিল। হাসপাতালে আমাকে একটি রুম দেওয়া হয়। জলন্ধরের এক উকিল বন্ধু আমার সেবা যত্নের ত্রুটি রাখলো না। মা'কে টেলিফোনে খবর দেওয়া হলে তিনিও মাঝরাতে এসে পৌঁছালেন। মা'র প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এই ছিল আল্লাহর অশেষ কৃপায় আমার জীবন রক্ষা পেয়েছিল। মা তখন আমাকে জানালো, যে লাহোর থেকে আমার বিদায়ের সময় মা কেন এত বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। তার আগের রাতে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেখেছিলেন যে হঠাৎ একটি ঘনকালো মেঘের সৃষ্টি হলো এবং তা সব কিছুকে ছেয়ে ফেললো। এর মধ্যে থেকে বিদ্যুৎ চমকালো এবং সব পরিষ্কার হয়ে গেল। লোকজন বলাবলি করতে লাগলো যে তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, শুধু মাত্র পাশের ঘরটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মা লক্ষ্য করে দেখলেন আমার ঘরটির বাইরের দিকে যেখানে বিদ্যুৎ পড়েছিল সেখানে একটি গাঢ় কালো দাগ পড়ে আছে। এই স্বপ্ন দেখার পর মা দান খয়রাত করেন এবং ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

দু'দিন জলন্ধর হাসপাতালে থাকার পর লাহোরের মেয়ো হাসপাতালে আমাকে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে আমাকে দশ দিন রাখা হয়। তারপর আমাকে মডেল টাউনে আমার বাসায় যেতে দেওয়া হয়। আমার আঘাত ও কাটা ঘা সন্তোষজনক ভাবে শুকিয়ে উঠছিলো। কিন্তু ১৬ই জানুয়ারী আমার গা উত্তপ্ত হয়ে প্রচন্ড জ্বর এলো। আমার মনে হয়ে ছিল যে হয়তো ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে, তাড়াতাড়িই তা ভাল হয়ে যাবে। মা কিন্তু অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়লেন ও কাতরভাবে নামাজে দোয়ায় ব্যপৃত হয়ে গেলেন। আমার জ্বর না থামা পর্যন্ত মাঝরাত বরাবর তিনি আমার সঙ্গে কাটালেন। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে তিনি আমাকে তার আবার শঙ্কিত হয়ে পড়ার কারণ বললেন, জলন্ধরে আমি আমার স্বপ্নের কিছু অংশ মাত্র তোমাকে শুনিয়েছিলাম। স্বপ্নের শেষের অংশটুকু শোনানো হয়নি। তা এই রকম

ছিল যে, পরিবারের কয়েক জন মহিলার সঙ্গে আমি পাশের (বাড়ীর কোথায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা দেখার জন্য) ছাদের উপর উঠে সেই ঘরের ভিতরে নেমে এলাম এবং সেখানে ঘরের মানুষদের সঙ্গে কথা বললাম, তারপর যেই আবার ছাদের উপর উঠে পা বাড়াতে যাবো আর চেয়ে দেখি ছাদটি ধ্বসে পড়ে গেছে, শুধুমাত্র কিছু কড়িবর্গা লেগে আছে। আমি থেমে গিয়ে সাথীদের সবাইকে বললাম যে, দেখুন ছাদটি পড়ে গেছে। অথচ একটু আগে আমরা ভেতর থেকে উপরের ছাদটিকে কত সুন্দর ও সাজানো দেখেছিলাম। তারপর আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি। এই সন্ধ্যায় তোমার জ্বর যখন আবার বেড়ে উঠে তখন আমি শঙ্কিত হয়ে পড়ি যে, এই বুঝি স্বপ্নের শেষ অংশ পূর্ণ হতে যাচ্ছে। সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি তার অসীম কৃপায় এখন আমাকে আশ্বস্ত করেছেন।

পরদিন সকালে ১৭ই জানুয়ারী ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিহার থেকে টেলিগ্রাম মারফত খবর এলো যে, আমার শ্বশুর জনাব শমসাদ আলী খান দুর্ঘটনাক্রমে গুলিতে নিহত হয়েছেন এবং তার লাশ ট্রেন যোগে কাদিয়ান আনা হচ্ছে দাফনের জন্য। ২০ বৎসর আগেকার আমার নিজের একটি স্বপ্নের কথা আমার স্মরণ হয়ে গেলো। আমি তখন লন্ডনে পড়াশুনা করছি। জানুয়ারী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দিকে আমি স্বপ্নে দেখলাম কে যেন আমাকে একটুকরা কাগজ দিলো। তাতে উর্দুতে লিখা ছিল– 'অনেক আশা ভরসার প্রতীক শমসাদ আলী খান এ মাসের ১৬ই তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। এ কথা লিখে রাখ, এতে অনেক নিদর্শন (ইঙ্গিত) আছে। জেগে উঠেই আমি আমার নোট বইতে এই স্বপ্নের বিবরণ লিখে রাখি। শমসাদ আলী খান তখন লাহোর গভঃ কলেজের ছাত্র ছিলেন। আমাদের মধ্যে বেশ ভাল বন্ধুত্ব ছিল এবং নিয়মিত চিঠি পত্রও লিখা হতো। তিনি বিবাহিত ছিলেন, একটি মেয়েও হয়েছিল ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বরে। আমি যখন এই স্বপ্ন দেখি তখন তার মেয়েটির বয়স এক বৎসর মাত্র। শমসাদ আলী খান তার এক চিঠিতে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন, আমি তার মেয়েটিকে আদর করছি। আমার মা শমসাদ আলী খানকে নিজের ছেলের মতই স্নেহ করতেন। এ হিসাবে তাদের বাড়ী আমাদের বাড়ীর পাশেই ধরা যেতে পারে। (অর্থাৎ মা স্বপ্নে যে ঘরের ছাদটি পড়ে যেতে দেখেছেন সেটি শমসাদ আলীর ঘরই ছিল)।

পরদিনই আমি লাহোর থেকে অমৃতসরে চলে আসি এবং ঐ মৃতদেহের সঙ্গে কাদিয়ান আসি। সেই শোকাবহ দায়িত্ব পালন শেষে আমি দিল্লী চলে আসি এবং ষড়যন্ত্র মামলার সিনিয়র ক্রাউন কাউন্সেল হিসাবে দায়িত্ব পালন শুরু করি। মা এরপর যখনই জলন্ধর দিয়ে কোথাও যেতেন আমার জীবন রক্ষার কৃতজ্ঞতায় দু'রাকাত নামাজ পড়তেন।

ইষ্টারের বন্ধের জন্য ট্রাইবুনালের অধিবেশন স্থগিত থাকার সময় মা'র সঙ্গে মিলিত হতে আমি লাহোর চলে আসি। লাহোর এসে আমি জানতে পারি যে, স্যার ফজলে হোসেন আমাকে খবর পাঠিয়েছেন, দিল্লী ফিরে যাওয়ার পথে আমি যেন তার সাথে সিমলায় সাক্ষাৎ করি। সিমলায় এসে আমি তাকে শয্যাশায়ী দেখতে পেলাম। তিনি জানালেন যে অনেক দিন থেকেই তার শরীর ভাল যাচ্ছিল না। এখন খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাই চার মাসের ছুটির দরখাস্ত করেছেন। তার অনুপস্থিতির সময়ে কাজ করার জন্য তিনি গভর্ণর জেনারেলের (লর্ড উইলিংডন) কাছে আমার নাম প্রস্তাব করেছেন এবং গভর্ণর জেনারেলও রাজি হয়েছেন। এর অর্থ ছিল ষড়যন্ত্র মামলার ক্রাউন কাউন্সেল পদ থেকে আমার পদত্যাগ। এই মামলার অভিযুক্তরা ছিল একদল তরুণ ও শিক্ষিত সন্ত্রাসবাদী। তাদের নিজেদের মামলা পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের খরচে উকিল দেওয়া হয়েছিল, যারা মামলাটিতে বাধা দেওয়ার জন্য ও ব্যর্থ করার জন্য সর্বপ্রকার কুটকৌশলেরও আশ্রয় নিচ্ছিল। আমার ওকালতির শেষ দিনের শেষে ট্রাইবুনালের সভাপতি ও বিপক্ষের উকিলরা নিয়মমাফিক আমার কিছু প্রশংসাসূচক কথা বললো। দু'জন অভিযুক্তও কিছু বলার জন্য আবেদন জানালো। আমি আশঙ্কা করলাম যে তাদের কথাবার্তা প্রশংসাসূচক তো হবেই না, বরং তারা আমাকে লজ্জিত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু ওরা যা বলেছিল আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যার সারমর্ম ছিল এই রকম আমাদের উকিলরা তার সম্বন্ধে যে প্রশংসা করেছেন আমরাও তাদের সঙ্গে একমত। আমরা ক্রাউন কাউন্সেল হিসাবে তার যোগ্যতার বিচার করার যোগ্য নই– কিন্তু আমরা তাকে আমাদের বিরুদ্ধে একজন ভদ্রলোকের মতই কেস পরিচালনা করতে দেখেছি।

তাদের মধ্যে একজন, যিনি জামিনে বাইরে ছিলেন, আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে বিদায় জানাতে রেলস্টেশনে এসেছিলেন।

দিল্লী থেকে আমি লাহোরে স্যার ফজলে হোসেনের সঙ্গে দেখা করতে আসি। তাকে তার বন্ধু-বান্ধবরা পর দিন এক ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। আমার জন্য কোন উপদেশ তিনি দিতে চান কি না তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'আমি তো তোমার দিকে সবসময় চেয়ে থাকতে পারবো না। তোমার নিজেরই সাঁতার কাটতে হবে, না হয় ডুবতে হবে।

আগের কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই আমি প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের একটি পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম। এটা ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহর বিশেষ এক কৃপা। আমার একমাত্র সম্বল ছিল দোয়ার দ্বারা আল্লাহর বিশেষ এক কৃপা। আমার একমাত্র সম্বল ছিল দোয়ার দ্বারা আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। সিমলা এসেই আমি দেখতে পেলাম

সেদিন বিকালেই একটি কেবিনেট মিটিং আছে, যাতে ভারত বিষয়ে সেক্রেটারী অব স্টেটস্ এর কাছে প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রেক্ষাপটে প্রতিরক্ষা ডেসপাচের যে খসড়া পেশ করা হবে তার বিষয়ে আলোচনা হবে। প্রতিরক্ষা ছিল এমন একটি বিষয় যেটা সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। এমন কেউ ছিল না যার কাছ থেকে কোন কিছু জানা যেতে পারে। আমি খসড়া ডেসপাচটি পড়তে শুরু করে দিলাম। পড়তে পড়তে দেখলাম খুব সুন্দর ভাবে লেখা একটি রিপোর্ট যেটা পড়ে বুঝতে আমার তেমন কোন অসুবিধাই হলো না। এর চার জায়গায় কিছু উন্নতির আবশ্যক আছে বলে আমি মনে করলাম এবং সেখানে মার্জিনে দাগ দিয়ে রাখলাম। মিটিং এ কমান্ডার-ইন-চীফ স্যার ফিলিপ চ্যাটাউকে সহায়তা করছিলো তার সুযোগ্য চীফ অব স্টাফ জেনারেল উইগ্রাম। যখন আমার বক্তব্য বলার সময় এলো আমি আমার কথা বললাম। প্রত্যেক বারই দেখলাম জেনারেল উইগ্রাম মৃদু হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে একমত হচ্ছেন। তিনি ঝুঁকে পড়ে স্যার ফিলিপকে কানে কানে কিছু বলছেন, আর তিনিও সম্মতি জানাচ্ছেন। মিটিং থেকে বের হয়ে আমার মনে হলো আল্লাহর অশেষ কৃপায় আমি আমার প্রথম পরীক্ষায় পাশ করেছি। এরচেয়েও বড় কথা ছিল স্যার ফিলিডা চ্যাটাউড-এর আস্থা ও সমর্থন অর্জন করা। পরবর্তীকালে অনেকগুলি ক্রান্তিলগ্নে তা বিশেষ ভাবে আমার সহায়ক হয়েছিল।

হোম অফিসের এই খসড়া যথাসময়ে ক্যাবিনেটের সামনে উপস্থিত করা হলো। একটি ব্যাপারে আমি খসড়াটির সাথে দ্বিমত ঘোষণা করেছিলাম। ক্যাবিনেটের বাকী সবাই আমার মতটিকেই গ্রহণ করেন এবং আমার নিজের তৈরী এই দ্বি- মতটিকে খসড়ার শেষে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। সেক্রেটারী অব স্টেটস এটি পড়ে লিখেন, 'এই সমস্যার একমাত্র যক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য সমাধানটি খসড়ার শেষে যংযুক্ত দ্বিমতের মধ্যেই আছে।

সিমলায় 'মা' আমার সাথে ছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের বেশ রাতে লাহোর থেকে টেলিগ্রাম মারফৎ আমার ছোট ভাই আসাদুল্লাহ্ খান জানালো যে আমার চাচাত ভাই চৌধুরী জালালুদ্দীন যিনি ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল ছিলেন এবং মার একান্ত স্নেহভাজন ছিলেন, কয়েক ঘন্টা অসুস্থতার পর ইন্তেকাল করেছেন। মা রাতের মত বিশ্রামে গিয়েছিলেন। যখন টেলিগ্রামটি পাই তখন চৌধুরী বশির আহমদ আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা দু'জন ঠিক করলাম রাতের মত আর এই দুঃসংবাদটি মা'কে না জানিয়ে সকালেই জানানো হবে। সকালে যখন তার ঘরে গেলাম, দেখলাম মা বিছানায় শুয়ে আছে তাঁর মুখটি খুবই বিষন্ন। আমার জিজ্ঞাসার জবাবে জানালেন, গতরাতের দুটি স্বপ্নের জন্যই এখন তার খুব

খারাপ লাগছে। একটি স্বপ্নে তিনি দেখেন, আমার বাবা আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে সাদা কাপড়ে মুড়িয়ে নিয়ে সিড়ি দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছেন। আত্মীয়টিকে মা চিনতে পারেন নি। এরপর মা জেগে উঠেন। তারপর আবার যখন ঘুমিয়ে পড়েন তখন আবার স্বপ্নে দেখেন কে যেন তাকে একটি নোট বই দিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? উত্তর পেলেন, জালালুদ্দীন বদলী হয়ে গেছে, এটা তার হিসাবের খাতা। আমি মাকে বললাম, তাহলে আজ আপনি আর যেতে পারছেন না। মা বললেন কেন? কি হয়েছে? আমি তাকে সব খুলে বললাম।

ভারতের বৃটিশ রাজত্বের সময়ে কিছু কিছু বৃটিশ মিলিটারী ইউনিট ভারতে মোতায়েন করা ছিল। তাদের বেতন-ভাতাদী ভারতকেই বহন করতে হতো এবং তা ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেটের অর্ন্তভূক্ত ছিল। এছাড়াও ভারতকে ঐ সব সৈনিকের রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং এর খরচও বহন করতে হতো। এইসব খরচকে বলা হতো ক্যাপিটেশন রেটস। বেশ অনেক দিন ধরেই ভারতের পক্ষ থেকে বৃটিশকে বলা হচ্ছিল যে ক্যাপিটেশন রেট ভারতের জন্য একটি বড় বোঝা। তাই এটি বিবেচনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেওয়ার জন্য একটি ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। অষ্টেলিয়ার চীফ জাষ্টিস হলেন এই ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান, দু'জন বৃটিশ ও দু'জন ভারতীয় জজ হলেন মেম্বার। শরৎকালে লন্ডনে এটার অধিবেশন বসার কথা ছিল। গভর্ণর জেনারেল আমাকে জানালেন যে স্যার ফিলিপ চ্যাটউড চান আমি যেন ট্রাইবুনালের সামনে ভারতের কেসটি তুলে ধরি, ওদিকে স্যার স্যামুয়েল হোর, তিনি ভারত বিষয়ক সেক্রেটারী অব ষ্টেটস ছিলেন, তিনি চাচ্ছিলেন আমি যেন তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেই। দু'টিই প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। আমি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়াই ঠিক করলাম।

গোলটেবিল বৈঠকের পর রাজ সরকার ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাবাবলী সম্বলিত একটি শ্বেতপত্র পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন। উভয় পরিষদের একটি জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির দ্বারা তা বিবেচনা ও রিপোর্টের ব্যবস্থা করা হয়। কমিটি ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে আহ্বান জানান তাদের সঙ্গে যৌথভাবে বসার জন্য এবং সাক্ষীদের জেরার সময় উপস্থিত থাকার জন্য। সেই প্রতিনিধিদলের আমিও একজন সদস্য ছিলাম। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে কমিটি কাজ শুরু করে, মাঝখানে কয়েক দিনের জন্য বন্ধ থাকে, তারপর আবার শরৎকাল পর্যন্ত সাক্ষীদের জেরা করা হয়। বন্ধের সময়টায় আমি একটি ভারতীয় প্রতিনিধিদল নিয়ে কানাডার টরোন্টতে কমনওয়েলথ রিলেসন্স কনফারেন্সে যোগ দিতে যাই।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার ফজলে হোসেনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আমাকে তার স্থলে গভর্ণর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নিয়োগ করা হয়।

আমার স্ত্রী আমার এই কর্মব্যস্ততা ও বার বার বাইরে যাওয়াতে খুব ক্লান্ত হয়ে যায় এবং মাকে অনুরোধ করলো যেন তিনি আমাকে বাইরে যাওয়ার কোন দাওয়াত নিতে নিষেধ করে দেন। মা তাকে বলেন, সে জানে তার কি করা উচিৎ। তার কাজকর্মে আমি কোন বাধা, এটা তাকে আমি বোঝাতে চাই না। যখনই আমি বাইরে যেতাম মা আমার স্ত্রীকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে থাকতেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এক বিকালে তিনি বাড়ীর ভেতর দিকে বাগানে বসেছিলেন, হঠাৎ নজরে গেল পাশের বাড়ীর নির্মীয়মান দালানের একজন মিস্ত্রী অন্য একজন মিস্ত্রীকে এ বাড়ীর দিকে ইশারা করে কি যেন বলছে। মার তাৎক্ষণিক সন্দেহ হলো যে শ্রমিক দু'জন হয়তো এ বাড়ীতে রাতের বেলা কিভাবে দেয়াল ডিঙ্গিয়ে চুরি করা যায় তা পরিকল্পনা করছে। পরক্ষণেই তিনি দু'জন নিরীহ গরীব শ্রমিকের ব্যাপারে মন্দ ধারনা বা সন্দেহের জন্য নিজেকে অপরাধী ভাবতে লাগলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে নিজের এই অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়ায় রত হয়ে গেলেন। সেই রাতেই তিনি যখন সেই বাগানের দিকের বারান্দায় (ঘেরা) শুয়েছিলেন তার হঠাৎ মনে হলো পায়ের কাছে কে যেন তার হাতের মোটা সোনার বালাটার দিকে হাত বাড়াচ্ছে। তিনি উঠে বসে পড়লেন, তারপর জিজ্ঞাসা বরলেন, 'তুমি কে? বলেই তিনি বাতি জ্বালাতে অন্যদের ডাক দিলেন। মাকে হাকডাক দিতে শুনেই এবং সবাই বাতি নিয়ে আসবার আগেই চোর চট করে বাগানে সটকে পড়লো। মাও তাকে মেয়েদের অংশে অনুপ্রবেশের জন্য বকতে বকতে তার দিকে ধাওয়া করে চললেন। চোর হয়তো হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। সে দেয়ালের দিকে চলে যাচ্ছিল। মাও তার পিছু পিছু চাকরদের ডাকতে ডাকতে যাচ্ছিলেন। মা বুঝতে পারছিলেন যে এটা খুবই বিপদজনক এবং চোর যে কোন মুহূর্তে এক আঘাতেই তাকে ধরাশায়ী করতে পারে। তবু তিনি আল্লাহ প্রদত্ত সাহসে আকুতোভয় ছিলেন এবং দেয়াল পর্যন্ত ধাওয়া করে গেলেন। ইতিমধ্যে আসাদুল্লাহ খান ও চাকররা চলে এলো এবং চোরকে দেয়ালের উপর শোয়া অবস্থায় ধরে ফেললো। চোরের যে দু'জন সঙ্গী বাইরে অপেক্ষা করছিল তাদেরও ধাওয়া করে ধরে ফেলা হলো। দেখা গেল, এরা সবাই পার্শ্ববর্তী নির্মীয়মান দালানের শ্রমিক, যাদের মা আগের দিন দেখেছিলেন। তাদের পুলিশে সোপর্দ করা হয় এবং বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়।

এখন মা আবার তাদের জন্য করুণা অনুভব করলেন। তিনি আশা করে রইলেন যে তাদের প্রতি কঠোর বিচার করা হবে না, শত হলেও তারা খুবই গরীব শ্রমিক

ছিল, হয়তো এক মুহূর্তের লোভের বশবর্তী হয়েই এই মন্দ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিল। বাড়ীর ভিতরে যে প্রবেশ করেছিল সে তো এক বৃদ্ধা মহিলার ভয়েই অস্থির হয়ে গিয়েছিল। মা ভাবলেন প্রথম জনের দু'তিন মাস জেলই যথেষ্ট, অন্য দুজনকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তাদের এক বছর করে জেল দিয়েছিলেন।

ঠিক এই পর্যায় আমি বাড়ী ফিরে আসি এবং মা আমাকে পুরো ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করে তাদের শাস্তির মেয়াদ কমাতে কিছু করার জন্য ধরে বসলেন। আমি স্বীকার করলাম যে, ওদের জন্য আমি কত দুর করতে পারবো এবং কিছু করতে পারব এবং কিছু করতে পারব কিনা বুঝতে পারছি না। ওদের আপীল তখন জজের কোর্টে স্থগিত অবস্থায় ছিল। ওরা যদি আমাকে বিশ্বাস করে রাজি হতো তাহলে আমি কোন ফি না নিয়ে তাদের আপীলটির পক্ষে কোর্টে ওকালতি করতে পারতাম। হতে পারতো বিচারক আমাকে ওদের পক্ষে ওকালতি ও দয়া প্রার্থনা করতে দেখে কিছুটা নমনীয় সিদ্ধান্ত দিতো। কিন্তু পরিস্থিতিটা আমার জন্য বেশ অসুবিধা জনকই হতো। বিচারক হয়তো মনে করতো আমি টাকার বিনিময়ে ওদের পক্ষে বলছি। আবার ওদের পক্ষে বলার জন্য আমাকে হয়তো আসাদুল্লাহ খানের বিবৃতির সমালোচনা ও আমাদের নিজেদের কাজের লোকের কথাকেও সমালোচনা করতে হবে। মা বললেন, তোমাকে এরকম পরিস্থিতিতে ফেলার কোন ইচ্ছা আমার নেই। অন্য পথ খুজে দেখো। আমি জানালাম যে যদি আদালত তাদের আপীল খারিজ করে দেয় এবং হাইকোর্টও পূর্ণবিবেচনা করতে রাজী না হয় তাহলে আমি গর্ভণর জেনারেলকে তাদের শাস্তি কমানোর জন্য অনুরোধ করতে পারি। মা এ প্রাস্তাবও অনুমোদন করলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের জন্য তিনি দোয়া করতে থাকবেন এবং যতদিন তাদের আপীলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না হলো মা ঐকান্তিক দোয়ায়রত হয়ে রইলেন। সেসন জর্জ তার রায়ে প্রধান আসামীর শাস্তি হ্রাস করে চার মাস করেন। অন্য দু'জন আসামীকে ইতিমধ্যে তাদের ভোগ করা জেলই নির্ধারণ করেন। মা খুব খুশী হলেন এবং অপরাধীদের ব্যাপারে তার দোয়ার কবুলিয়তের জন্য শোকরানা আদায় করলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে মা একটি অভূতপূর্ব স্বপ্ন দেখেন যার পূর্ণতার মধ্যে অনেক দিক দিয়েই শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি যেন নিজের ঘরেই আছেন, জানালা দিয়ে একটি আলোক ডান দিক থেকে বাদিকে ধীরে ধীরে ঘড়ির দোলকের মত দোল খাচ্ছে। যখনই সেটা জানালার সামনে লম্বালম্বি অবস্থানে এলো তার মধ্যে থেকে একটি খুব গুরুগম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেলো মা

মনোযোগ দিয়ে শুনতে পেলেন, পাঞ্জাবী ভাষায় শব্দ হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই হবে চীফ জাষ্টিস, নসরুল্লাহ খানের পুত্র জাফরুল্লাহ খান'। দোলকটি বা দিকে গিয়ে আবার ডান দিকে আসতে লাগলো, আবার জানালা বরাবর আসার পর একই কথা আরো দৃঢ় ভাবে উচ্চারিত হলো। তৃতীয় বারের মত এটা ঘটলো। তার পরই মা জেগে যান।

মা স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমাকে খুলে বললেন। এর ব্যাখ্যা যাই হউক না কেন, কিছু কিছু জিনিস ছিল খুব পরিস্কার। সেই উজ্জ্বল আলোক, কণ্ঠস্বরের গুরুগাম্ভীর্য, 'নিশ্চয়ই হবে' বলে নিশ্চয়তা দান এ সবগুলোই বলে দিচ্ছিলো যাই হউক না কেন তা ঘটবে আপাত অসম্ভব্যতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে। আমার পরিচয়, আমার পিতার নাম নসরুল্লাহ যার অর্থ আল্লাহর সাহায্য, এর এই অর্থ ছিল যে, যা ঘটবে তা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটবে না, আল্লাহ তাআলার বিশেষ কৃপার ফলেই ঘটবে। এটাও এখানে নিহিত ছিল যে, মাঝখানের সময়টুকুতে আমার অবস্থা স্লান হয়ে যাবে না বা আমি অভাবেও পড়বো না।

এই স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছিল ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে মা স্বপ্ন দেখার ৩ বৎসর পর (তার মৃত্যুর ৩২ বৎসর পর)। যে কোর্টের মাধ্যমে তা পূর্ণ হয়েছিলো তা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিতই হয়নি। যখন তা প্রতিষ্ঠিত হয় সে দিনটি ছিল আমার ৫৩ (তিপ্পান্ন)তম জন্ম দিন। যেভাবে এই স্বপ্নের বাস্তবায়ণ হয়েছিল তা আজকের দিনের বস্তুবাদী ও সন্দেহবাদী বিশ্বের জন্য সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান খোদার অস্তিত্বের এক জলন্ত প্রমাণ হয়ে রইল, যার সাথে তাঁরই এক অতি নগণ্য, প্রায় নিরক্ষর এক দাসী, যার একমাত্র গুণ ছিল অন্তরে সেই খোদার ভক্তি, ভালবাসা ও ভয়, সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। যেহেতু এই স্বপ্নের পূর্ণতার মধ্যে আমার জন্য প্রশাসনের কর্মজীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে তাই আমার কর্মজীবনের বিভিন্ন স্তরের ও ঘটনা বহুল তার বিভিন্ন পর্যায়গুলি ও খুটিনাটি দিকগুলির আলোচনা আবশ্যক হবে।

অনুচ্ছেদ- ৯

স্বপ্নের বাস্তবায়ন

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সাধীলাল লাহোর হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস হন। তিনি ছিলেন খুবই দূরদর্শী ও কূটকৌশলী লোক। কিছু কিছু ঘটনার দ্বারা আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে যতদূর তার ক্ষমতায় কুলায় তিনি আমার চাকুরীর উন্নতিতে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার ফজলে হোসেন আমাকে জানালেন যে গভর্ণর স্যার জিওফ্রে-ডি-মন্টেমোরেন্সি হাইকোর্ট বেঞ্চের শূণ্য পদের জন্য আমার নাম প্রস্তাব করার জন্য স্যার সাধীলালকে অনেক অনুরোধ ও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চীফ জাষ্টিসকে (স্যার সাধীলালকে) রাজী করতে পারেননি। প্রায় একই সময়ে আমার ছোট ভাই আসাদুল্লাহ খান, সে তখন লন্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়াশুনা করছিল, আমাকে এক চিঠিতে জানালো যে লাহোর হাইকোর্টের বিচারক জাষ্টিস হ্যারিসন, যিনি ছুটিতে লন্ডন গিয়েছিলেন, তাকে বলেছে যে, স্যার সাধীলাল কখনো আমার নাম হাইকোর্ট বেঞ্চের শূণ্য পদের জন্য সুপারিশ করবে না।

সেই স্যার সাধীলাল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে প্রীভি কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন এবং সেই বৎসরের মে মাসেই হাইকোর্ট ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। এপ্রিল মাসে তিনি আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন যেন আমি তার সঙ্গে দেখা করি। সেই সময়ে হাইকোর্ট বেঞ্চে একটি পদ খালি ছিল, আর আমি ভাবলাম চীফ জাষ্টিস বোধ হয় এবার আমার নাম প্রস্তাব করতে রাজি হয়েছে। চৌধুরী স্যার শাহাবুদ্দিনও আমাকে তাই বললেন এবং জানালেন, স্যার সাধীলাল আমার সঙ্গে দেখা করতে ব্যাগ্র হয়ে আছেন। আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, আমি হাইকোর্ট বেঞ্চের পদটির জন্য আর ইচ্ছুক নই, এ কথা চীফ জাস্টিসকে তিনি জানিয়ে দিতে পারেন।

স্যার সাধীলালের স্থলে এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন জাস্টিস স্যার ডগলাসইয়াং কে লাহোর হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস নিয়োগ করা হলো। দায়িত্বভার গ্রহণ করে প্রথম রোববারেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি যখন তাকে স্বাগতম জানালাম, তিনি প্রথম কথাতেই বললেন, চৌধুরী সাহেব আপনি কেন বেঞ্চে আমার সাথে বসছেন না? আমি তাকে এই প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানালাম এবং আমার অপারগতা প্রকাশ করলাম। তিনি তখন বললেন, যদি আপনি মন পরিবর্তন করেন তবে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। এরপর

যখনই বেঞ্চে পদ খালি হবে আমি প্রথমেই আপনার নাম প্রস্তাব করে পাঠাবো। প্রথম থেকেই তিনি আমার প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। তার কোর্টে আমি কোন কেস হারিনি।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্যার ফজলে হোসেনের স্থলে আমাকে গভর্ণর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করা হয়। সেখানে একজন সদস্যের মেয়াদ ছিল পাঁচ বৎসর। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে আমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে এক নতুন রাজকীয় ফরমান বলে আমাকে আর একটি পূর্ণ মেয়াদের জন্য সদস্য নিযুক্ত করা হয়। বৃটিশ রাজত্বের ১৬৩ বৎসরে এইরুপ তার কখনো ঘটে নাই।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ফেডারেল (পরবর্তীকালে সুপ্রীম) কোর্ট অব ইন্ডিয়ার একজন মুসলমান বিচারপতি স্যার শাহ সুলাইমান ইন্তেকাল করেন। চীফ জাষ্টিস স্যার মরিস গওয়ার গভর্ণর জেনারেলকে জানালেন যে, একমাত্র আমাকেই তিনি মুসলমান বিচারপতি হিসাবে ঐ শূণ্যপদের জন্য প্রস্তাব করতে রাজি আছেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিনলিথগো জানালেন যে আমাকে তিনি ছাড়তে পারছেন না। তাদের মধ্যে মত বিরোধ যেহেতু মিটানো যাচ্ছিল না, সে জন্য অস্থায়ীভাবে বোম্বে হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস স্যার জন ব্যামন্টকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হয়। আমি কিন্তু তখন এইসব ব্যাপারে কিছুই জানতে পারিনি।

১০ই জুন আমি একটি স্বপ্ন দেখি। দেখি যে, সিমলায় আমার অফিস ঘরে বসে আমি কাজ করছি। হঠাৎ বারান্দার দিকের দরজা খুলে আমার ভগ্নিপতি ইনায়েত উল্লাহ খুব বড় একটি হাড়ী নিয়ে ঘরে ঢুকলো। স্বপ্নটি এতই জীবন্ত ছিল যে, সকালে আমি তাড়াহুড়ো করছিলাম যাতে নাস্তার সময় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তৈরী হওয়ার পরই শুধুমাত্র আমার মনে পড়লো যে, আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, বাস্তবে নয়।

দু'দিন পর আর একটি স্বপ্নে আমার বন্ধু ইনাম উল্লাহর সঙ্গে আমার দেখা হয়। দুটো স্বপ্নের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যের গন্ধ পেলাম এবং আমার মনে হলো শুভ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ১৪ই জুন আমি স্বপ্নে এমন একজনের দেখা পেলাম যার নাম ছিল আমারই নামে 'জাফরুল্লাহ'। এখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, কিছু পরিবর্তন হওয়ার ছিল যার জন্য আমাকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছিলো, যাতে আমি এটাকে ঐশী কৃপা হিসাবে অভ্যর্থনা জানাতে ও গ্রহণ করতে সক্ষম হই এবং তাকে আমার সাফল্যের চাবিকাঠি রূপে অনুধাবন করতে পারি। কেননা ইনায়েত উল্লাহর অর্থ হলো ঐশীকৃপা, ইনামুল্লাহ অর্থ হলো ঐশী পুরষ্কার এবং জাফরুল্লাহ্ অর্থ হলো বিজয় বা সাফল্য, যা আল্লাহর কাছ থেকে আসে।

১৫ই জুন রোববার দিল্লী থেকে শেখ ইজাজ আহমদ ও চৌধুরী বশির আহমদ ১০ দিনের বন্ধে বেড়াতে এলো। তাদের আমি জানালাম, আমার জন-প্রশাসনের কর্মজীবনে কিছু পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি কোন স্বপ্ন দেখেছি কি না। আমি তাদের তিনটি স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বললাম। গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে আলোচনার জন্য আমার নির্দিষ্ট দিন ছিল সোমবার। আমি তার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে টেলিফোনে বললাম, যেহেতু আমার কোন বিষয়ে আলাপ করার বা কোন রিপোর্ট পেশ করার নেই, কাজেই আমি আর দেখা করতে চাই না। প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাকে জানালো যে, গভর্ণর জেনারেল আমাকে দেখা করতে বলেছেন। যখন আমি তার সাথে দেখা করলাম তিনি আমার কাছে তখন ফেডারেল বেঞ্চের পদ পুরনের ব্যাপারে তার সঙ্গে চীফ জাস্টিসের মতানৈক্যের কথাটি প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, শেষ পর্যন্ত আমরা ঠিক করেছি যে আপনার পছন্দের উপরই সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। যদি আপনি আমার সাথে থাকার ইচ্ছা করেন তাহলে চীফ জাষ্টিসকে অন্য কোন সহকর্মী খুজে নিতে হবে এবং এটাই আমি আপনার কাছ থেকে আশা করছি। আর যদি আপনি কোর্টে যেতে চান তাহলে এই ক্ষতি পূরণের জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে। কাজেই বিষয়টি ভালভাবে বিবেচনা করে পরের সপ্তাহে আমাকে জানাবেন।

স্যার, পরের সপ্তাহে নয়, আমি এখনই তা আপনাকে জানাতে পারি।

আহ! তাহলে তো খুবই খুশীর কথা, আপনি যেতে চান না।

না স্যার, আম যেতে চাই।

আমি খুবই নিরাশ হলাম। কিন্তু আমি চীফ জাষ্টিসকে কথা দিয়ে দিয়েছি। তাই আমাকে তা রক্ষা করতে হবে। এখন আমাকে বিশ্বাস করে বলুনতো আপনার তো এখনো দ্বিতীয় মেয়াদের চার বছর বাকী (গভর্ণরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে), আপনার পরামর্শে প্রশাসন বিষয়ে যথেষ্ট পরিমান সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে যে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে আপনার বয়সী লোকের জন্য যে কোন ধরনের উন্নতি ও সুযোগ বিদ্যমান, অথচ আপনি এ থেকে চলে যেতে চাচ্ছেন ও কোর্টের বাঁধের মধ্যে আবরুদ্ধ জলে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাচ্ছেন।

'বোধ হয় এটা মনমানসিকতার ব্যাপার। প্রশাসন থেকে আইন বিষয়েই আমি বেশী স্বাচ্ছন্দ অনুভব করি।'

'যা আপনার ভালো মনে হয়। আশা করি আমাকে ছেড়ে যেতে আপনি খুব তাড়াহুড়ো করবেন না।'

'কোর্টের এখনো বন্ধের সময়, অক্টোবরের প্রথম দিকে আবার বসবে। সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারলে আমি খুশী হবো।'

'এটাও আমার জন্য কিছুটা সান্ত্বনা।'

এই লর্ড লিনলিথগো ছিলেন পালামেন্টের উভয় পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের ব্যাপারে প্রস্তাবিত সম্মলিত যে শ্বেতপত্র পার্লামেন্টে পেশ করা হয় তা বিবেচনার জন্যই ঐ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ঐ জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি যখন সাক্ষীদের পরীক্ষা করেন তখন যে ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে যৌথভাবে ঐ কমিটির সাথে কাজ করতে হয় আমি তার সদস্য ছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে চেয়ারম্যান ঐ কমিটির কাজে আমার অবদানের ব্যাপারে খুব খুশী হয়েছিলেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিংডন-এর স্থলে লর্ড লিনলিথগো ভারতের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল হন। আমি তখন গভর্ণর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য। সব সময়ই তিনি আমার ব্যাপারে সদয় ছিলেন। সব সময় উৎসাহ দিতেন এবং আস্থা রাখতেন। আমিও তাকে হতাশ করে ফেডারেল কোর্টে যেতে অনিচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিগত তিনটি স্বপ্ন আমার জন্য একটি ঐশী নির্দেশ ছিল, যা পালন করা আমার জন্য জরুরী ছিল। যদিও তিনি প্রকৃতই খুব হতাশ হয়েছিলেন, তবু আমার উপর থেকে তার আস্থা মোটেও কমে নাই। আমারই পরামর্শে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছিল আমার নিজের পোর্টফলিও ল' ও সরবরাহ-এর দায়িত্ব দু'জন নতুন সদস্যকে দেওয়ার কথা হচ্ছিল। গর্ভণর জেনারেল আমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন ঐ দু'টো পদে কাদের নেওয়া যায়। আমি যাদের নাম বললাম, তিনি তাদেরকেই নিলেন। তারপর তাদের স্বীকৃতি পত্র আনার জন্য আমাকে ভার দিলেন। আমি তা পূর্ণ করেছিলাম।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে চীনের প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইসেক এক সরকারী সফরে দিল্লীতে আসেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তারও ভাইসরয়ের মধ্যে এ বিষয়েও স্থির হয় যে দু'দেশ পরস্পরের সাথে সরাসরি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে। মার্চ মাসে লর্ড লিনলিথগোর নিজের হাতের লিখা একটি চিঠি আমার কাছে এসে পৌছে, কোর্ট থেকে আমি যেন ছয় মাসের ডেপুটেশনে গিয়ে চীনের চুং কিংয়ে ভারতের কূটনৈতিক মিশনের উদ্বোধন ও দায়িত্বভার গ্রহণ করি সেই অনরোধ নিয়ে। জাপানীদের প্রবল চাপের মুখে চীনারা ছয় মাসের জন্য তাদের রাজধানী চুং কিংয়ে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। চিঠিটিতে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি

বিষয়ের বিস্তারিত উল্লেখ ছিল। চুং কিংয়ে গ্রীস্মকালে প্রচন্ড জাপানী বোমা পড়ছিল এবং শহরটি সংকটের মুখে ছিল।

আমি আমার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে যেতে পারবো না। জাস্টিস হিসাবে আমার বেতন ও ভাতাদি চুং কিংয়ে বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের চেয়ে বেশী, তাই আমি কোন অতিরিক্ত বেতন ভাতাদি পাবো না। আমি এমব্যাসেডর পদ মর্যাদায় এজেন্ট-জেনারেল নামে অভিহিত হবো। এতো সব সত্ত্বেও তিনি জানালের যে, আমি যেন পদটি নিতে রাজি হই। কেননা এই পদের দায়িত্ব ও কর্তব্যাবলী আমার চেয়ে যোগ্যতা ও মর্যাদার সাথে আর কেউ করতে পারবে বলে তিনি মনে করতে পারছেন না।

তার এই চিঠি আমাকে বেশ চিন্তায় ফেললো। ১৯৫৩ খ্রী: থেকে ১৯৪১ খ্রী: পর্যন্ত সরকারের অংশ হিসাবে প্রচুর পরিশ্রম ও চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। এই সপ্তম বৎসরে এসে আমি প্রথম ছুটি ভোগ করতে যাচ্ছিলাম। কাশ্মীরের গুলমার্গে আমরা একটি 'কটেজ' ভাড়া করেছিলাম এবং যথেষ্ট খরচ করে তাতে আসবাব পত্র কিনে ছিলাম। চুং কিংয়ের পরিস্থিতি, কঠোর আবহাওয়া, সব সুযোগ সুবিধাদী থেকে পুরো দুস্তর বঞ্চিত থাকা, এসবই ছিল গুলমার্গের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। এই প্রস্তাবের মধ্যে এমন কোন কিছুই ছিল না যা আমাকে সামান্য আকৃষ্ট করতে পারতো। প্রত্যেক বিবেচনায় তা আমার বিরোধী ছিল।

কিন্তু লর্ড লিনলিথগোর আমন্ত্রণ ছিল আমার উপর তার পূর্ণ আস্থার প্রতীক। আমি কোর্টের জীবনে ফিরে যাওয়াতে তিনি আমার উপর হতাশ হয়েছিলেন। এখন একটি সুযোগ হলো যে, আমি তাকে বুঝতে দেই যে আমি তার সেই আস্থা উপলব্ধি করি। তাই আমি প্রস্তাবটি গ্রহণ করলাম।

কোর্টের বন্ধের সময়টাতেই আমি মোটামুটি চুং কিংয়ে ছিলাম। যখন ফিরে এলাম তখন দেখলাম মাত্র একটি ছোট ব্যাপার শুনানীর জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সেটি যখন শেষ হলো আমাকে বলা হলো প্যাসিফিক রিলেসন্স কনফারেন্সে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব নিয়ে যেতে। কানাডার কুইবেক প্রদেশের লরেন্সিয়ান পর্বতমালার স্কিইংক্ষেত্র মন্টট্রেম্বব-ন্ট-এ তা' অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। তখনকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে সেই যাত্রা ছিল এক সুদীর্ঘ রোমাঞ্চকর বরং বলা ভাল খুবই ঝুকিপূর্ণ যাত্রা। দিল্লী থেকে করাচী, কায়রো, (তিন দিনের বিরতি) ওয়াদী হালকা, খার্তুম, জিঞ্জা, (উগান্ডা), ষ্ট্যাপলিভীল (কঙ্গো), লিওপোল্ডভীল, ল্যাগোস (তিন দিনের যাত্রা বিরতি), আক্রা (দু'দিনের বিরতি), আটাল (ব্রাজিল), জর্জটাউন (বৃটিশ গায়না),

মিরন্সি, নিউইয়র্ক (চার দিনের বিরতি), মন্ট্রিয়েল, মন্টট্রেমরেন্ট এই ছিল আমাদের যাত্রাপথ।

কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর ভারত বিষয়ক সেক্রেটারী অব ষ্টেটের কাছ থেকে আমি একটি অনুরোধ পেলাম। ভারতের সাংবিধানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য মি. এমারী আমাকে লন্ডন যেতে অনুরোধ করেছেন। মন্ট্রিয়েল থেকে গ্লাসগো পর্যন্ত পুরো পথটাই যেতে হবে একটি বোম্বারে (বোমারু বিমানে)। প্রচন্ড তুষার ঝড়ে আমরা সাত দিন মন্ট্রিয়েলে আটকা পড়ে রইলাম।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী আমি লন্ডনে এসে পৌঁছাই। যুদ্ধের জন্য লন্ডনে জীবন যাপন করতে হতো শত বাধা নিষেধের মধ্যে। তবু আশ্চর্য্যের ব্যাপার ছিল এই যে, আরাম আয়েশের তেমন কোন অভাব ছিল না। যত দিন লাগবে বলে মনে করেছিলাম, আলোচনা তার চেয়ে অনেক বেশী দিন চলেছিল। ফলে মার্চের প্রথম দিকে আমি লন্ডন ত্যাগ করতে সমর্থ হই। লন্ডন থেকে পুলি, স্যানন, লিসবন, বাথ্রাষ্ট (গ্যাম্বিয়া), ল্যাগোস (তিন দিনের যাত্রা বিরতির এই ফাঁকে আমি ল্যাগোসের আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করি), লিওপোল্ডভীল, এলিজাবেথভীল, জিন্‌জা খার্তুম (দুই দিনের যাত্রা বিরতি), কায়রো, করাচী হয়ে দিল্লী ফিরে আসি।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ারস-এর প্রেসিডেন্ট হিসাবে লন্ডনের সেন্ট জেমস স্কোয়ারস্থ চ্যাথাম হাউজে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ রিলেসন্স কনফারেন্স-এ একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই আমি ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে আবেগপূর্ণ আবেদন জানিয়ে একটি বক্তৃতা করি। সেই সন্ধ্যার এক বেনকোয়েটে আমি এই প্রস্তাব আরো বিস্তারিতভাবে পেশ করি। এই দুটো বক্তৃতা ছিল সেই প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ের শুরু যার ফলশ্রুতিতে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী ভারত বিভক্তির পরিকল্পনা পেশ করেন। হঠাৎ করেই আমি সমস্যায় পড়ে গেলাম। বিভক্তির পর আমি ভারতে থেকে যাবো কি না। আমি তখন ফেডারেল কোর্টের একজন সিনিয়র বিচারপতি। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার জন্য ইতিমধ্যে আমার যথেষ্ট সুনামও হয়েছিল। বিভক্তির সময় যদি আমি ভারতে থাকার সিদ্ধান্ত নিতাম তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করার মত কারণ ছিল যে, আমিই ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি হতাম। আমি সিদ্ধান্ত নিতে সামান্যতম দ্বিধা করি নাই যে,

ভারতে আমি স্থায়ী হবো না। সেই দিনই আমি আমার পদত্যাগ পত্র পেরণ করি যা, এক সপ্তাহ পর গৃহীত হয়।

ভূপালের শাসক মহামান্য নওয়াব স্যার হামিদুল্লাহ্ খান ছিলেন চেম্বার অব প্রিন্সেস-এর চ্যান্সেলর। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই আমরা পরস্পরকে ভালভাবে জানতাম। তিনি আমাকে সামনের কঠিন দিনগুলোতে ভূপালে তার কাছে থাকার জন্য ও তার সাংবিধানিক পরামর্শ দাতা হিসাবে কাজ করার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি ভূপালে চলে গেলাম।

সব কিছুই ঘটছিল খুব তাড়াতাড়ি ও দ্রুতলয়ে। জুলাই (১৯৪৭) মাসে মি. এম এ জিন্নাহ (কায়দে আজম) আমাকে দিল্লীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে লাহোরে পাঞ্জাবে বাউন্ডারি কমিশন এর সামনে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে দাবী আদায়ের জন্য বললেন, আমি তা পূর্ণ করলাম। সেপ্টেম্বরের শুরুতে (১৯৪৭) তিনি আমাকে করাচী থেকে নিয়ে গেলেন এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করতে বললেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি আমাকে পাকিস্তানে চলে আসার জন্য ধরে বসলেন। তিনি আমাকে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বা পাকিস্তানের পররাষ্টমন্ত্রী যে কোন একটি পদ বেছে নিতে বললেন। আমি পরেরটি বেছে নেই। ভূপালের মহামান্য প্রশাসক আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমি পাকিস্তানের পররাষ্টমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করি। পাঁচ বছরের বেশী সময় ধরে আমি জনগণের কাছে জনপ্রিয় ছিলাম। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কায়দে আজম মারা যান। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হন। পূর্ব পাকিস্তানের চীফ মিনিষ্টার কায়দে আজমের স্থলে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হন এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লিয়াকত আলী খানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি ছিলেন দয়ালু, পূণ্যবান এবং ধর্মমনা ব্যক্তি, আর তৎকালীন মৌলভী সাহেবদের কথায় সহজেই কান দিতেন। মৌলভী সাহেবরাও দেখলো নীতি নির্ধারনে হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতায় ঢুকে পড়ার এটাই মোক্ষম সুযোগ। গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন খুব দৃঢ়চেতা ব্যক্তি, কিন্তু ক্ষমতা লোভী প্রধানমন্ত্রী ও তার মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে গেলে এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেলেন। ততদিনে আমিও গোঁড়া মৌলভীদের বাছাই করা লোকদের মধ্যে প্রধান লক্ষ্যস্থল ও আগ্রাসনের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হলাম। নতুন প্রধান মন্ত্রী বগুড়ার জনাব মোহাম্মদ আলী এবং ক্যাবিনেটের আমার অন্যান্য সহকর্মীরা তাদের পূর্ণ সমর্থন ও আস্থা আমার প্রতি

ঘোষণা করলেন। কিন্তু একদল তরুণ সদস্য আমার বিরুদ্ধে বিষোদাগার করতে শুরু করলো। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের দিকে আমি অনুভব করতে শুরু করলাম যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে আমার পদ অধিকার করে থাকা পাকিস্তানের অস্তিত্বের পক্ষেই মারাত্মক হতে পারে। তাই আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেই। প্রধান মন্ত্রী আমাকে ছাড়তে রাজী ছিলেন না। কিন্তু দেখা গেল যে, সে বৎসর জাতিসংঘের বিশ্ব আদালতে (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাষ্টিস) একটি শূণ্য পদে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরনের জন্য আমার নাম প্রস্তাব করে বসে আছে। ঐ কোর্টের ভারতীয় বিচারপতি স্যার বি এন রাউ-এর মৃত্যুতে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পদটি খালি হয়েছিল। তাই প্রধান মন্ত্রী আমাকে ঐ পদের ইলেকশন করতে দিতে রাজী হলেন, বোধ হয় এই ভেবে যে ঐ পদে আমার নির্বাচনের কোন সম্ভাবনাই নাই। কেননা জাতিসংঘের সাধারণ রীতি এই ছিল যে, যে দেশের লোকের মৃত্যুতে বিচারপতির পদ খালি হতো সাধারণত সেই দেশের লোকের দ্বারাই পদটি পুনরায় পুরন করা হতো। এক্ষেত্রেও একজন ভারতীয় বিচারপতির নাম আমার পূর্বেই প্রস্তাব করা হয়েছিল। যাই হউক আমিই নির্বাচিত হই এবং ১৯৫৪ সালের ৭ই অক্টোবর কোর্টের একজন সদস্য হই। আমার মেয়াদ ছিল স্যার বি এন রাউ-এর অবিশিষ্ট মেয়াদটুকু মাত্র। অর্থাৎ ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত কালে আমি কোর্টের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হই। নরওয়ের বিচারপতি হ্যালগ ক্লাস্টার্ড প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন সততার প্রতিমূর্তি, কিন্তু অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যক্তি। আমাকে তিনি তার প্রতি সহানুভূতিশীল পেলেন। ফলে আমার প্রতি তিনি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন এবং কোর্টের এমন কিছু দায়িত্বাবলী আমার দ্বারা করাতেন যা নিয়মানুসারে শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টের করার কথা। তাঁর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি এমন কথাও বলতেন যে, আমি তার উত্তরাধিকারী হিসাবে এই কোর্টের প্রেসিডেন্ট হচ্ছি। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারীতে আমার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি পূর্ণবার নির্বাচিত হতে না পারি তবে আর প্রেসিডেন্ট হওয়া যাচ্ছে না। তিনি বললেন, এতে কোন সন্দেহ নাই। এটা মোটেই চিন্তা করা যায় না যে আপনি পূর্ণঃনির্বাচিত হবেন না।

কিন্তু বাস্তবে, যা তিনি তার সদয় বিবেচনাতে চিন্তাও করতে পারেন নাই। তাই হয়েছিল, যখন ইলেকশনের ফল পাওয়া গেল। ডেপুটি রেজিস্টার সাহেব অত্যন্ত বিষন্নভাবে আমার চেম্বারে এসে জানালেন যে, আপনার জন্য একটি দুঃসংবাদ আছে। কোন বিচারকই এবার পূর্ণঃনির্বাচিত হন নাই।

আমার নিজের ব্যাপারে আমি বলতে পারি যে, সেটা আমার জন্য কোন খারাপ খবর ছিল না। যদি আল্লাহ তাআলা এটা চেয়ে থাকেন যে, আমি অন্য কোন স্থানে থেকে অন্য কোন ভাবে তার উপাসনা করি তবে আমি তাতেই সন্তুষ্ট।

ইলেকশনে আমার সাফল্যের জন্য আমি একজন অত্যন্ত ধর্মপরায়না মহিলা মিসেস আজিজাহ্ ওয়াল্টারসকে বিশেষ ভাবে দোয়া করতে বলেছিলাম। আমি তাকে ফোনে যোগাযোগ করে জানালাম, ইলেকশনে আমি জিততে পারি নাই। কোন মন্তব্য ছাড়াই তার তাৎক্ষনিক উত্তর ছিল কুরআনের সেই আয়াত– **'তোমার প্রভূ তোমাকে ভুলে নাই– না, তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট'**। অতীতের প্রতিটি মুহূর্তের চেয়ে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের মুহূর্তগুলো তোমার জন্য ভাল হবে। তোমার প্রভূ তোমার প্রতি তার অনুগ্রহ বষর্ণ করতে থাকবেন এবং তুমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে।

পর দিন তিনি আমাকে জানালেন যে, যখনি আমি তাকে ইলেকশনের ফল জানিয়েছিলাম তখন থেকে তিনি এটাই শুধু চিন্তা করতে পারছেন যে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমাকে আরো ভালো, আরো উচ্চ কোন পদে বসিয়ে কাজ দিতে চাচ্ছেন।

অনুচ্ছেদ- ১০

স্বপ্নের পরিপূর্ণতা

বিশ্ব আদালত থেকে আমার মেয়াদ শেষ হওয়ার অর্থ ছিল জনপ্রশাসন বা জনসংগঠন থেকে আমার কর্মজীবনের অবসান। ব্যারিষ্টার হিসাবে একুশ বছরের অভিজ্ঞতা, ১৯৩৫ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত ২৬ বৎসর ক্রমাগত জনপ্রশাসনের বিভিন্ন পদে কর্মজীবন, সব মিলিয়ে ৪৭ বৎসরের কর্মময় জীবন আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছিল। তখন আমার বয়স ছিল ৬৮ বৎসর। কোর্ট থেকে আমি একটি পেনশনের অধিকারী ছিলাম। তা আমার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কেমব্রিজে আমি একটি রুচিসম্মত এপার্টমেন্ট কিনে ছিলাম, তাতে আসবাবপত্র কিনে সেখানেই বাস করতে শুরু করি। আমার ইচ্ছা ছিল বছরের আট মাস এখানে কাটাবো, বাকী শীতকালীন চার মাস পাকিস্তানের রাবওয়ায়, সেখানে আমি একটি বাড়ী তৈরী করেছিলাম, এখানে কাটাবো। ইতিমধ্যে আমার লেখা একটি বই, **'ইসলামঃ আধুনিক মানুষের কাছে এর অর্থ'** ধর্মীয় প্রকাশনা বিভাগের প্রধান সম্পাদকের কাছে দাখিল করা হয়েছিল এবং তা ছাপার জন্য অনুমোদিতও হয়েছিল। এতে আমার আশার সঞ্চার হয়েছিল যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে আমি হয়তো কিছুটা অবদান রাখতে পারবো।

কিন্ত ১৯৩৪ সাল থেকেই আমার মা-এর সেই স্বপ সম্বন্ধে আমি সবসময় পূর্ণ সচেতন ছিলাম। আমার পূর্ণ আস্থা ছিল যে তার অন্যান্য স্বপ্নের মত এটাও সত্য স্বপ্ন ছিল এবং অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমি শুধু ঐ স্বপ্নের পূর্ণ ব্যাখ্যা (তাবীর) জানতাম না, বা কখন কিভাবে তা পূর্ণ হবে তাও বুঝতে পারছিলাম না। তা শুধুমাত্র জ্ঞাত ছিল সেই মহামহিমের যিনি এই স্বপ্ন আমার মা'কে দেখিয়ে ছিলেন। তা সত্ত্বেও আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি কখনো সেই স্বপ্ন দ্বারা প্রভাবিত হইনি। ইতিপূর্বে বর্ণিত আমার কর্মজীবনের যে কথাগুলো আমি বর্ণনা করেছি তা দ্বারা একথা নিশ্চয়ই প্রতিভাত হবে যে, স্বপ্নের নিছক বাস্তবায়নের জন্য আমি কোন সুযোগ নিজ থকে গ্রহণ করি নাই। যদিও আমি গভর্ণর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ছেড়ে ১৯৪১ সালে ফেডারেল কোর্টে চলে এসেছিলাম, কিন্তু সেটি ছিল পূর্ববর্তী সপ্তাহে আমার নিজের দেখা তিনটি স্বপ্নের জন্য, মা'র স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য নয়। তা না হলে আমি গভর্ণর জেনারেলের ইচ্ছাকেই পূর্ণ করতাম।

যদি ১৯৪৭ সালে বিভক্তির সময় আমি ভারতে থেকে যেতাম তাহলে আমিই হতাম ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি। সেই বৎসরই ডিসেম্বর

মাসে আমাকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির পদ, একটি পছন্দ করতে বলা হলে আমি স্বেচ্ছায় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদটি নেই। মিয়া আব্দুর রশিদকে পরে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫২ সালে মিয়া আব্দুর রশিদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার সময় তিনি বারবার আমাকে অনুরোধ করেন যেন তার পরে আমি প্রধান বিচারপতির পদটি নিতে রাজি হই এবং তিনি যেন আমার নাম প্রস্তাব করতে পারেন। তার সেই সদিচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে কাজ করতে হয়। তা এজন্য নয় যে প্রধান বিচারপতি হতে আমার কোন বিরাগভাব ছিল। তার কারণ ছিল এই যে, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবেই পাকিস্তানের জন্য আমি বেশী খেদমত করতে পারবো।

এখন এই ৬৮ বৎসর বয়সে পাকিস্তানের কোন উচ্চ আদালতে আমার আর কোন সুযোগ ছিল না। যদি আমি বিশ্ব আদালতে পূর্ণ নির্বাচিত হতাম হয়তো প্রেসিডেন্ট ক্ল্যাডষ্টেট-এর স্থলে আমিই প্রেসিডেন্ট হতাম। তা না হয়ে আমি তো পুনঃনির্বাচিত হলামই না বরং এমন কোন দৃষ্টান্তই ছিল না যে একবার এই কোর্ট থেকে যাওয়ার পর আর কেউ এই আদালতে দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হয়েছে বা আমার আরও সম্ভাবনা রয়েছে। তথাপি আমি আমার মা'র স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে কোন মুহূর্তে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি নাই। তাই ঐ স্বপ্নের (যে স্বপ্নে আমি চীফ জাষ্টিস হবো বলে বলা হয়েছে) প্রকৃত ব্যাপারে তার সর্বজ্ঞ ও সর্বপ্রদাতা আল্লাহর উপরই ছেড়ে ছিলাম।

১৯৬১ সালের গ্রীষ্মকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান রাষ্ট্রীয় সফরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার পথে লন্ডনে যাত্রাবিরতি করেন। তিনি আমাকে লন্ডনে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে তিনি আমাকে পেতে চান। আমি তাকে বললাম, তিনি যেন এজন্য না ভাবেন যে, এখন আমার কোন চাকুরী নাই, তাই আমাকে একটি চাকুরী দিতেই হবে। তিনি জানালেন যে, না তিনি জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বকে বলিষ্ঠ করে তোলার ব্যাপারে উদগ্রীব, তাই তিনি আমাকেই পাঠাতে আগ্রহী।

ফেরত যাত্রার সময়ও তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং জানালেন তিনি আমাকে নিয়োগের প্রস্তাবটি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল দ্যাগ হ্যামায়সোল্ডকে জানিয়েছিলেন। সেক্রেটারী জেনারেল খুব খুশী হয়েছেন। কাজেই আমি যেন বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে গেছে বলে মনে করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঞ্জুর কাদেরের সঙ্গে আলাপ করে পাকিস্তান চলে আসি যাতে ভাল ভাবে ব্রিফীং নেওয়া যায়।

১২ই আগষ্ট আমি নিউইয়র্ক পৌঁছাই। একমাস পরেই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ষোলতম অধিবেশন বসার কথা। আমার ডেপুটি হিসাবে ছিল মি.

আগা শাহী। তিনি আমাকে জানালেন তিউনিসিয়ার মি. মঙ্গিস্লিম ও ইন্দোনেশিয়ার মি. আলী সাসত্রোয়ামিদজয়ো অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী হওয়ার বার্মার স্থায়ী প্রতিনিধি মি. উথান্ট-এর মধ্যস্থতায় স্থিরিকৃত হয়েছে যে মি. মঙ্গিস্লিমকে ষোলতম ও মি. আলী সাসত্রোয়ামি, দজায়াকে সতেরতম অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হবে। ষোলতম অধিবেশনটি তার আগের গুলোর মতই ঢিমে তেতালা ভাবেই চললো এবং ক্রীসমাস পার হয়ে ১৯৬২ সালের জানয়ারী পর্যন্ত চললো।

১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়া সরকার জানালো যে, সতেরতম অধিবেশনের জন্য মি. আলী সাসত্রোয়ামিদজয়োকে ছাড়া সম্ভব হবে না। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মেই সতেরতম অধিবেশনের প্রেসিডেন্টের পদ নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা, কানাঘুষা শোনা যেতে লাগলো। জর্দানের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আব্দুল মুনিম রিফাই আমাকে এসে ধরলেন, আমার নাম প্রস্তাব করার জন্য তাদের যেন আমি অনুমতি দেই।

আমার প্রতিক্রিয়া ছিল এরূপ: বর্তমানে জাতিসংঘে আফ্রো-এশিয়ান রাষ্ট্রগুলো মোটামুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরূপ শোনা যাচ্ছিলো যে তারা এখন সাধারণ পরিষদে স্টীম রোলার চালাবে। আমার মতে এমন কিছু করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না যাতে এটার উপর আরো রং ছড়ানোর সুযোগ হয়। তাই একজন আফ্রিকান প্রেসিডেন্টের পরপর একজন এশিয়ান প্রেসিডেন্ট হওয়ার অর্থ তাই হয়। তাই এটা এড়ানো উচিৎ।

তাহলে আপনার পরামর্শ কি? রিফাই বললো।
আমার মতে এখন আমাদের ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর সাথে একটি সমঝোতায় আশা প্রয়োজন যাতে এ বৎসর তাদের থেকে কেউ প্রেসিডেন্ট হয় এবং পরের বৎসর আফ্রো-এশিয়দের মধ্য থেকে এভাবে পশ্চিমা-ল্যাটিন এবং আফ্রো-এশিয়দের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাবে প্রেসিডেন্টের পদ ভাগ হওয়া উচিত।

আমি তাহলে আরব দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করে নেই, তারপর আপনাকে জানাবো। রিফাই কথা বলে বিদায় নিল।

পরে এ ধরনেরই একটা সমঝোতায় পৌঁছানো গেল। ঠিক হলো আর্জিন্টিনার স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আমাদিওকে সতেরতম অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হবে। যেই না এই ধরনের কথা ঠিক হলো তখনই শোনা গেল আর্জেন্টিনায় অভ্যুত্থান হয়েছে। রাষ্ট্রদূত আমাদিও নয়া সরকারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে পদত্যাগ করে বসলেন। ল্যাটিন দেশগুলো আর একজন প্রার্থীর ব্যাপারে নিজেরা

সম্মত হওয়ার আগেই সিলোনের (বর্তমানের শ্রীলংকা) স্থায়ী প্রতিনিধি প্রফেসর মালালাসেকরা নিজেই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বলে ঘোষণা করে বসল। ফলে বলাবলি শুরু হলো যে, ঠিক আছে এশিয়ানরা যদি প্রেসিডেন্ট হতে চায় তাহলে এবার তারা হতে পারে। এই পর্যায়ে এসে আব্দুল মুনিম রিফাই আমাকে ধরে পড়লেন যেন আমার নাম প্রস্তাব করতে আমি আপত্তি না করি।

প্রফেসর মালালাসেকরা মস্কোতে তার দেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং দাবী করতের যে তার পকেটে পঁচিশ থেকে ত্রিশটি দেশের ভোট গচ্ছিত আছে (ঐগুলো সম্ভবত কমিউনিষ্ট ও বুদ্ধিষ্ট দেশগুলোর ভোট)। কাজেই অন্য যে কোন প্রার্থী যদি বাকী বিশ্ব থেকে তার সমান সমান ভোটও পেয়ে যায়, তবু অন্তত এই গচ্ছিত পঁচিশ ভোটের ব্যবধানে তাকে হারতে হবে।

অধিবেশন শুরুর আগেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে এই অধিবেশনের আমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হচ্ছি। আমি পরিষদের নিয়ম-বিধি পড়েছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না চেয়ারে বসে আমি কতটুকু মানিয়ে নিতে পারবো। অর্ধ-ডজন থেকে বেশী 'পয়েন্টস অব অর্ডার' উত্থাপন করা হয়ে থাকে প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই, আর প্রেসিডেন্টকে তাৎক্ষণিক ভাবে নিজে থেকেই বিধি ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্ত দিতে হয়। এটা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। অধিবেশন শুরুর কিছুক্ষণ আগে আমি উঠে গেলাম, জোহরের নামায পড়লাম। তাতে অত্যন্ত কাতর ভাবে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলাম যেন তিনিই আমার সমর্থক ও পথ প্রদর্শক হন।

বিদায়ী প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে নির্বাচনী সভা বসলো। ব্যালেটে দেখা গেলো প্রফেসর মালালাসেকরা পেয়েছে সাতাস ভোট, আর আমি পেয়েছি বাহাত্তর ভোট। আমাকে মঞ্চে নিয়ে আশা হলো। অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করি পবিত্র কুরআনের ২০ পারার ২৬ থেকে ২৯ আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে। পরে ক্রিশ্চিয়ান জার্নাল লিখেছিল যে খ্রীষ্টান প্রেসিডেন্টরা কখনোই মঞ্চ থেকে খোদার নাম উচ্চারণ করতো না, এজন্য যে কমুনিষ্ট দেশগুলো আপত্তি জানাবে। আর এখন একজন মুসলমান প্রেসিডেন্ট কুরআন আবৃত্তির মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করেছে, অথচ কমুনিষ্ট দেশগুলো সামান্য আপত্তিও জানালো না।

আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপায় অধিবেশন খুব সুন্দর ভাবেই চলেছিলো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব বিরাজ করছিলো। প্রথম বারের মতো সভা সময়ানুবর্তিতা পালন করে ঠিক সময় মতো বসতে পেরেছিল। প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করে এজেন্ডা (কর্মসূচী) গৃহীত হয়। আমি নিজেকে যে কোন কিছুর জন্য সহজলভ্য করে রেখেছিলাম। নিরাপত্তা পরিষদ ও অন্যান্য সংস্থার জন্য নির্বাচন হলো মাত্র

দু'ঘন্টা সময়ের মধ্যে, যা কিনা অন্যান্য সময়ে ঘন্টার পর ঘন্টা লাগতো। এজেন্ডার প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয় এবং সেগুলোর নিস্পত্তি করা হয়। দেখা গেল নির্দিষ্ট সময়ের চব্বিশ ঘন্টা আগেই সেসন (অধিবেশন) তার দায়িত্ব পালন শেষ করেছে, যা খুব কম সময়েই ঘটেছে। আমার জন্য শুকরিয়ার বিষয় ছিলো এটি যে, সমস্ত অধিবেশনের সময়টুকু জুড়ে কোন পয়েন্ট অব অর্ডার উত্থাপিত হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ্।

আমার কুটনৈতিক কর্মজীবন ১৯৬১ আগষ্ট থেকে ১৯৬৪ ফেব্রুয়ারী ছিল আমার শান্ত সমাহিত জীবনের আশার বিপরীত, যা আমি কেম্ব্রিজে বসতি স্থাপনের সময় আশা করেছিলাম। তবু তাতে কোন হৈ চৈ তাড়াহুড়া ছিল না, বরং পূর্ণ গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা বজায় ছিল। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে আমাকে একই সঙ্গে আর্জেন্টিনায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয় এবং রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমি দু'বার বুয়েনাস আয়ার্স ভ্রমণ করি। আমি সেখানে একটি এ্যামব্যাসি স্থাপনের প্রস্তাব করি, তা গৃহীত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনাব খুররম খান পন্নী রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে সেখানে যান।

১৯৬২ সালে ত্রিনিদাদ টোবাগোর স্বাধীনতা উৎসবে আমি পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করতে যাই। আমার এক সপ্তাহ পোর্ট অব স্পেনের অবস্থান ছিল সবচেয়ে আনন্দঘন ও চমৎকার অভিজ্ঞতা। ধীর, শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ পন্থায় সবকিছু করা হয়েছিল বলে তার প্রশংসা করেছিলাম।

আমার প্রেসিডেন্ট থাকাকালিন ১৯৬২ সালে আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে এবং জাতিসংঘের সদস্য ভুক্ত হয়। সেই সময়ে আমি আর একবার সম্মানিত হই। আলজেরিয়া প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন প্রেসিডেন্ট আহমেদ বেন বেল্লাহ্, আরো ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ আল খামিস্তি। পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলে ছিলেন তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। প্রেসিডেন্ট বেন বেল্লা মোহাম্মদ আলী সাহেবকে বিশেষ ভাবে বলে গেলেন যেন অধিবেশ শেষে আমাকে আলজেরিয়া ভ্রমণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন ফিট, জেরাল্ড কেনেডী বক্তৃতা করেছিলেন।

অধিবেশন শেষ হওয়ার পর পরই আমাকে ইসলামাবাদে ডেকে পাঠিয়ে নির্দেশ দেওয়া হলো, পূর্ব ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের জন্য আমি যেন একটি প্রোগ্রাম তৈরী করে ফেলি। সেই অনুসারে আমি ১৯৬৩ সালের জানুয়ারীতে এডেন থেকে শূরু করে সোমালিয়া, কেনীয়া, টাঙ্গানিকা, উগান্ডা, সুদান, ঈজিপ্ট, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, ও মরক্কো সফর করি। প্রত্যেক স্থানে আমাকে সাদর

অভ্যর্থনা জনানো হয়, ভাল আতিথেয়তা দেখানো হয়। সোমালিয়ার পার্লামেন্টে আমাকে ভাষণ দিতে দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক সোমালিয়ার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব দেওয়া হয়। যে যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আমার পরিচয় হয় তাদের মধ্যে ছিলেন, কেনিয়ার মিঃ জুমোকেনিয়াত্তা, কেনিয়ার গভর্ণর আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু মিঃ ম্যালকম মেকডোনাল্ড, টাঙ্গানিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ জুলিয়াস নায়ারেরে, যার আতিথেয়তায় দার-এস সালামের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে আমি ছিলাম, একজন প্রচন্ড সম্ভাবনাময় যুবপুরুষ শেখ আমরি আবেদী, উগান্ডার প্রধান মন্ত্রী ডঃ মিল্টন ওবোর্টে, উগান্ডার রাজা স্যার ফ্রেডরিক মুটেসা, সুদানের মেহেদীর নাতী মিঃ সাদিক আল-মেহেদী, আমার প্রিয় বন্ধু মিসরের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল জামাল আব্দুল নাসের, লিবিয়ার রাজা হিজ-মেজেষ্টি কিং ইদ্রিস, তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট হাবীব বারগিবা, আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমদ বেনবেল্লা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ আল খামিস্তি, আলজিরিয়া পর্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট ফারহাত আব্বাস, মরক্কোর রাজা দ্বিতীয় হাসান, যিনি মরক্কোর সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেছিলেন এবং মরক্কোর প্রধান মন্ত্রী আহমেদ বেলাফ্রেজ। ১৯৪৭ সালে প্রেসিডেন্ট সূকরী কোয়াট্র্যালী কর্তৃক আমাকে সিরিয়ার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব দ্বারা সম্মানিত করা হয় এবং ১৯৫৪ সালে জর্দানের বাদশা হুসেইন কর্তৃক আমাকে হাসেমীদের সর্বোচ্চ খেতাব দ্বারা ভূষিত করেন।

পূর্বোল্লিখিত শেখ আমরি আবেদী একজন নওজোয়ান ছিলেন এবং আহমদীয়া আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাবওয়ায় (আহমদীয়া আন্দোলনের কেন্দ্র, পাকিস্তান) ইসলামের উপর পড়াশুনা করে ইসলাম ধর্মের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি দার এস সালামের প্রথম টাঙ্গানিকান মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমার সফরের সময় তিনি পার্লামেন্টের সদস্য ও পশ্চিমাঞ্চলের কমিশনারও হয়েছিলেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আঠারতম অধিবেশনে তিনি টাঙ্গানিকান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন তার আগেই তিনি দেশের বিচার মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর খাদ্যে বিষক্রিয়ায় তিনি মারা যান। জুলিয়াস নায়ারেরে, জুমো কেনিয়াত্তা, মিল্টন ওবোটে তার শববাহকদের মধ্যে ছিলেন। ঐ সময়ে কাম্পালায় একটি সুন্দর আহমদীয়া মসজিদের উদ্বোধনের সুযোগ আমি লাভ করি।

১৯৬৩ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর আমন্ত্রণে আমি রাশিয়া সফর করি। ফেরার পথে কোপেন হেগেন ও হেলসিঙ্কিও সফর করি। রাশিয়ায় আমি লেলিনগ্রাদ, তাসকান্দ ও সমরকন্দ সফর করেছিলাম। ফিরে আসার পথে আমি ওয়ারশ, প্রাগ ও জুরিখ ভ্রমণ করি, জুরিখে আহমদীয়া মসজিদের উদ্বোধনীতে অংশ নেই।

তাসকান্দে ও সমরকন্দে আমি তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের ও উজবেকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিরাট একতা দেখতে পাই। আমার মনে হয় দক্ষিণ রাশিয়ার সবটুকুর ক্ষেত্রেই একথা খাটে।

সতেরতম অধিবেশনের সময় আল্লাহ্‌র কৃপায় আমার এতো সুনাম হলো যে ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝির দিকে আমি ভাবতে লাগলাম যে আন্তর্জাতিক আদালতে তৃতীয় বার্ষিক নির্বাচনে আমার জেতার সম্ভাবনা কতটুকু। সে বৎসরই শরৎকালে ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ব্যাপারটি ছিল এরকম ঃ যে পাঁচজন বিচাপতির মেয়াদ ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা তাদের তিন জনই ছিলেন ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলোর লোক। ১৯৪৬ সালে যখন এই কোর্টের প্রথম নির্বাচন হয় তখন জাতিসংঘের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ, যার মধ্যে কুড়িটি দেশই ছিল ল্যাটিন আমেরিকার। তখন যে পনেরজন বিচারপতি নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যভুক্ত ৫টি দেশের পাঁচজন সদস্য ছিলেন। বাকী দশ জনের মধ্যে চারজনই ছিলেন ল্যাটিন আমেরিকার দেশের, যা তাদের জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যানুপাতে তাদের প্রাপ্যতার সমান। ১৯৬৩ সালে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা একশ'এর বেশী হয়ে পড়ে। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকানদের সংখ্যা কুড়িটিই ছিল। কাজেই যে তিনটি ল্যাটিন পদ হচ্ছে তাতে একজন এশিয়, একজন আফ্রিকান ও একজন ল্যাটিন পূনঃর্নিবাচিত করা হউক এটাই ছিল একটি জোরদার অভিমত। লেবাননের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ফুয়াদ আম্মন ছিলেন এশিয়দের মধ্যে একজন প্রার্থী? আমি ভাবলাম এবার একটি ল্যাটিন পদের জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে। তাই যথারীতি আমার নামও প্রস্তাব করা হলো।

মিঃ আগা শাহী (পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলে আমার ডেপুটি) আমাকে জানালো যে, লেবাননের একজন সিনিয়র কূটনীতিবিদ করাচী হয়ে যাওয়ার পথে তার সাথে দেখা করে উপদেশ খয়রাত করে গিয়েছে যে, লজ্জা থেকে বাঁচতে হলে যেন আমার নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কেননা তাদের কাছে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনের লিখিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর এরকম সম্ভাবনাও খুবই কম যে দু'জন এশিয়ান একসঙ্গে নির্বাচিত হবে। মিঃ আগা শাহী অবশ্য আন্দাজ করলো যে দু'জন এশিয়ান এর একসঙ্গে নির্বাচিত হওয়ার চিন্তা ঠিক ঝেড়ে ফেলা যায় না।

একজন প্রার্থী নির্বাচিত হতে হলে নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদ উভয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হতো। তখন নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল এগারো, ফলে ছয় জনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হতো। প্রথম

ভোটাভোটিতে দেখা গেল মিঃ আম্মন উভয় পরিষদেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং আমিও উভয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছি। পার্থক্য ছিল এই যে, নিরাপত্তা পরিষদের ভোট তার ক্ষেত্রে ছিল সাতটি, আমার ক্ষেত্রে ছিল ছয়টি। এতে আমাদের দু'জনেরই নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একটি পদ্ধতিগত জটিলতা দেখা দিল। নিরাপত্তা পরিষদের ভোটাভোটিতে ৫ জন নয়, ৬ জন সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছিল (অর্থাৎ যেখানে অনেক প্রার্থীর মধ্য থেকে মোট পাঁচজনকে নির্বাচিত করতে হবে সেখানে ছয়জন সদস্য নিরাপত্তা পরিষদের ভোটের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছিল) যার ফলে নিরাপত্তা পরিষদের ভোটাভোটি পুনরায় প্রয়োজন হয়ে পড়লো। দ্বিতীয় ভোটাভোটিতেও ছয়জন সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো তবে আমার ভোটসংখ্যা ৭-এ উঠলো আর মিঃ আম্মন এর ভোটসংখ্যা ৭ থেকে কমে ৬ হয়ে গেল। তৃতীয়বার ভোটাভোটি হলো। এবার পাঁচজন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র চারজন সাধারণ পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারলো। তাই এ চারজনকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হলো। আমি তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। মিঃ আম্মন শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদে মাত্র পাঁচ ভোট লাভ করতে পেরেছিলেন, যদিও সাধারণ পরিষদে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। আফ্রিকান প্রার্থী সাধারণ পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেননি, কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। এর ফলে চারটি শূন্য পদ পূরণ হলো। পঞ্চমটির জন্য আবার ব্যালটের প্রয়োজন পড়লো। পঞ্চম পদের জন্য ভোটাভোটিতে আফ্রিকান প্রার্থী উভয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেলো। তাই তাকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হলো। আমার অন্য ডেপুটি ডঃ ভি, এ, হামদানী তো আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে এটা কিভাবে সম্ভব হলো, যে প্রথম উভয় পরিষদে মিঃ আম্মনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা স্বত্তেও শেষ পর্যন্ত তিনি ফেল করলেন। আর আমি জিতে গেলাম। আমি তাকে বলেছিলাম যে অফিসে পৌঁছি আমি তাকে এর নিগূঢ় কথাটি বলবো। তবে এর পেছনে আল্লাহ্‌র অসীম কৃপা ও পরিকল্পনা বিরাজ করছিল। আলহামদুলিল্লাহ্।

১৯৬৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী আমি আমার পূর্ণ মেয়াদ নয় বৎসরের জন্য কোর্টের কাজে যোগদান করি। সে দিনটি ছিল আমার পঁচাত্তরতম জন্ম দিন। কোর্টে আমার মূল বয়োজ্যাষ্ঠতা আমি হারিয়ে ছিলাম, ফলে আমার সহকর্মীদের এগারোজনের জুনিয়র হয়ে পড়লাম। যে তিন জন আমার সঙ্গে নির্বাচিত হয়েছিলো শুধু তারাই আমার জুনিয়র ছিল।

নিউজিল্যান্ডের সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্ণরের এক দাওয়াত আসে ১৯৬৫ সালের নভেম্বরে, সেখানে ব্যাংকারদের অ-কারিগরী বিষয়ের উপর এক সেমিনারে

বক্তৃতার জন্য। অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে আমার কিছু কাজ ছিল, সেগুলো শেষ করে নভেম্বরে আমি সানফ্রানসিসকো থেকে অকল্যান্ড (নিউজিল্যান্ড) যাই। পথে অবশ্য যাত্র বিরতি করি। ফিজি দ্বীপপুঞ্জে। সেখানে আমি একটি সুসংগঠিত ও উন্নয়নশীল আহমদীয়া জামাআত দেখেছিলাম। এই দ্বীপগুলো ছিল পৃথিবীর স্থলভূমির এক হিসাবে শেষ প্রান্ত। আন্তর্জাতিক সময় রেখা এদিক দিয়ে গিয়েছে। আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার প্রথম দিকের একটি ইলহাম ছিল এরূপ ঃ **"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"** আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে আল্লাহ্‌র অশেষ ফজলে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে আহমদীয়া আন্দোলনের উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে।

নিউজিল্যান্ডে আমার প্রতিটি মুহূর্তই ছিল খুব উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক। নিউজিল্যান্ড থেকে বিমানে আমি সিডনি (অষ্ট্রেলিয়া) যাই। ক্যানবেরায় আমি চমৎকার তিনটি দিন কাটাই।

ইতিপূর্বে ১৯৫৮ সালে আমি উমরা পালন করেছিলাম, মদীনায়ও গিয়েছিলাম। ১৯৬৭ সালে বাদশা ফয়সালের অতিথি হিসাবে আল্লাহ্‌র গৃহে হজ্জ পালনের ও মদীনা সফরের তৌফিক পেয়েছিলাম। আনোয়ার আহমদ ও তার স্ত্রী আমিনা বেগম আমার সঙ্গে ছিল এবং আমার আরাম আয়েশের সব ব্যবস্থা করেছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সেই সেবার জন্য অশেষ পুরস্কার দান করুন।

সে বৎসরই আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিমন্ত্রণ জানানো হয়। বলতে গেলে পৃথিবীর স্থল ভাগের আরেক প্রান্ত কেপটাউনে আমি আরেকটি আহমদীয়া জামাআতের সাক্ষাৎ পাই ও সদস্যদের সঙ্গে দেখা হয়। আমি ঐ দেশের এক্সিকিউট, লেজিশ্লটিভ ও জুডিশিয়াল রাজধানী গুলিতে ও অন্যান্য বড় শহরগুলিতে ভ্রমণ করি। আমি তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ও পরবর্তীতে প্রেসিডেন্টে ডঃ ভরষ্টার-এর সঙ্গেও দেখা করি। অনেক কিছুই আমি দেখেছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথা হয়েছিল। সুপ্রীমকোর্টের এক অধিবেশনে আমি বসে একটি আপীল কেসের শুনানী দেখেছিলাম।

দক্ষিণ আফ্রিকা একটি জটিল ও বিষাক্ত মানবিক সমস্যার মধ্যে জড়িত, যার সমাধান খুব সহজ নয়। কিছু উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু তা খুবই অপ্রতুল ও দোদুল্যমান, তা হচ্ছে থেমে থেমে এবং অর্ধ উৎসাহে। কেন্দ্রীয় সরকার গৃহসংস্থান ও শিক্ষা নিজের দায়িত্বে নেওয়ার পর দু'টির বেশ উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এটাও ভাল করে বুঝতে হবে যে অশ্বেতকায়'দের গৃহসংস্থান যত ভাল হবে এবং শিক্ষা দিক্ষায় তাদের সুযোগ সুবিধা যত বাড়বে ততই সাদাকালোর ভেদাভেদ সম্পর্কে তাদের অনুভব তীক্ষ্ম হয়ে উঠবে, যে বৈষম্যের মধ্যে তারা ইতিমধ্যে বাস করে আসছে।

এটাকে অন্যভাবে বলা যায় যে যতই তারা নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়ে উঠতে থাকবে ততই যে বঞ্চনার মধ্যে তাদের রাখা হয়েছে তার জ্বালা তাদের আত্মাকে আরো বেশী করে দহন করতে শুরু করবে। কাজেই শ্বেতকায়দেরও এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে, যেন দ্রুততর ভাবে ঐ বৈষম্যের দূরীকরণে তারা অগ্রসর হয়। আত্মার যেখানে অসুস্থতা সেখানে লক্ষ্য হওয়া উচিৎ সেই আত্মারই চিকিৎসা করা। সবচেয়ে দুঃখ জনক ব্যাপার হলো এই যে, শ্বেতকায়রা তো নিজেদেরকে খুব ধার্মিক বলে থাকে, কিন্তু অশ্বেতকায়রা যে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট তাদের মত মানুষ সে কথাটি মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। আর আল্লাহ্ যে তাদের মত অশ্বেতকায়'দেরও দৈহিক, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি চান এটাও যেন শ্বেতকায়রা মানতে চায় না।

১৯৬৯ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের পর কিছু বিচারক ১৯৭০ সালে কোর্টে যোগ দেওয়ার দরুন একজন প্রধান বিচারপতি (প্রেসিডেন্ট অব দি কোর্ট) নির্বাচনের প্রশ্ন উঠলো। স্যার জেরাল ফিট্ জমরিস ও আমার নাম বলাবলি হতে লাগলো। আমার ধারনা জন্মালো যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তখন একজন তৃতীয় বিচারপতি উঠে এলেন। এই ত্রিকোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সবকিছুই অনিশ্চিত হয়ে গেল। শুধুমাত্র পদ্ধতিগত দীর্ঘসুমিতার আশঙ্কা বাড়লো। বাস্তবে তাই হয়েছিল। ব্যালটের পর ব্যালট হতে থাকলো, কিন্তু চূড়ান্ত ফয়সালা হলো না। পরে ব্যালট গ্রহণের দ্বিতীয় দিনে পরিবর্তন সূচীত হলো এবং আমিই নির্বাচিত হলাম এই আদালতে এশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট। এভাবেই প্রায় ৩৬ বৎসর পর মায়ের দেখা একটি স্বপ্ন পূর্ণ হলো, যা কোন মানবীয় প্রচেষ্টা বা আশা আকাঙ্খার ফল নয়। বরং এটা পূর্ণ হয়েছিল প্রকৃত ঐশী পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে।

১৯৩৪ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আমার কর্মজীবন ও কাজের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে দেখুন যা পূববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে বর্ণনা করে এসেছি। ১৯৩৪ সালে স্যার সাধী লাল শেষ পর্যন্ত হাইকোট বেঞ্চে আমার নাম প্রস্তাব করতে রাজী হয়েছিলেন। তখন আমার বয়স ছিল একচল্লিশ বৎসর। যুক্তি-যুক্তভাবেই আমি আশা করতে পারতাম যে ষাট বৎসর বয়সে অবসর নেওয়ার আগে আমি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হতে পারবো। একই কথা খাটে স্যার ডগলাস ইয়াং এর প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও ; যাতে কয়েক সপ্তাহ পরেই হাইকোর্টের প্রথম স্থায়ী শূন্য পদে নিযুক্তির জন্য তিনি করেছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে আমার পাঁচজন অতিরিক্ত বিচারপতির উপরে স্থান পাওয়ার কথা ছিল।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির প্রস্তাবও পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বই বেছে নেই। ১৯৫২

সালে মিয়া আব্দুর রশীদ যিনি তৎকালে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। আমাকে তার স্থলাভিষিক্ত হতে জোর করে ধরেছিলেন, কিন্তু আমি রাজী হইনি।

১৯৬১ সালে যদি আন্তর্জাতিক আদালতে আমি পুনঃনির্বাচিত হতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমি প্রেসিডেন্ট ক্লাডষ্ট্যান এর স্থলে কোর্টের প্রেসিডেন্ট হতাম। কিন্তু আমি পুনঃনির্বাচিত হইনি, মনে হয়েছিল সেখানে আমার জন-জীবনের সমাপ্তি।

জাগতিক মানসিকতার দৃষ্টিতে আমার মায়ের স্বপ্নের বাস্তবায়নের আর কোন আশা বা সম্ভাবনাই বাকী ছিল না। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম তাঁর স্বপ্ন সত্য ছিল। এর মধ্যে একটি ঐশী প্রতিশ্রুতি ছিল যার পূর্ণতা অপরিহার্য ছিল। আমি শুধু জানতাম না কখন কি ভাবে সেটি পূর্ণ হবে। পবিত্র কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে **'নিশ্চয়ই মনে রেখ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু অধিকাংশই তা জানেনা'** (১০ ঃ ৫৬)। আল্লাহ্ তাআলা তো একটি দরজা বন্ধ করেছিলেন, তিনি তো অন্য কোন দরজা খুলে দিতে পারেন। ৬৮ বৎসর বয়সে জাতিসংঘে পাকিস্তানের রাষ্টদূত হিসাবে আমার প্রেরণ ছিল সেই 'অন্য দরজা'। কিন্তু আবার সেই অমোঘ ঐশী লীলা দেখুন। ১৯৬১ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট হওয়ার কথা তিউনিশিয়ার মিঃ মঙ্গী সেলীম ১৭তম অধিবেশনের প্রেসিডেন্টের পদটি ইন্দোনেশিয়ার মিঃ আলী সাসত্রোয়ামিদজয়োকে দেওয়ার জন্য কথা দেওয়া ছিল। ঐ ক্রমানুসারে যদি হতো তাহলে প্রেসিডেন্টের পদটি পর্যায়ক্রমে পরের বৎসর (১৯৬৩ সালে) পেতো ল্যাটিন আমেরিকানরা, তার পরের বৎসর (১৯৬৪) আফ্রিকা, তার পর বৎসর (১৯৬৫) পশ্চিমা দেশগুলো, তার পর বৎসর (১৯৬৬) আবার এশিয়া। ততদিনে আমার বয়স হতো ৭৭ বৎসর এবং নিশ্চয় জাতিসংঘ থেকে বিদায় নিয়ে যেতাম। কিন্তু ঘটনা ঘটলো এরূপ যে ঐ বৎসর (১৯৬২) মিঃ আলী সাসত্রোয়ামিদজয়োকে পাওয়া গেল না। তখনও আমার প্রস্তাব মতেই সে বৎসর ল্যাটিনরা প্রেসিডেন্ট হওয়ার কথা, এশিয়ানরা হবে তার পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে। কিন্তু এখানেও দেখুন কি হলো! আর্জেন্টিনায় বিপ্লব ঘটে যাওয়ার কারণে ল্যাটিনদের মনোনীত ব্যক্তি আর্জেন্টিনার এ্যামবাসেডর মিঃ আমদিও জাতিসংঘে তার পদ থেকে পদত্যাগ করে বসলেন। সেখানে ১৯৬২ সালে সাধারণ পরিষদের সভাপতিত্বের জন্য আমাকেই ঠেলে পাঠানো হলো।

আল্লাহ্‌রই অশেষ ফজলে সেই সভাপতিত্ব এতই ভাল হয়েছিলো যে আমি অত্যন্ত সুনাম অর্জন করি যার ফলে ১৯৬৩ সালে ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের সময় আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতির একটি আসনের জন্য আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেই।

লেবাননের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ফুয়াদ আম্মনও একজন প্রার্থী ছিলেন এবং আমার পূর্বেই নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন জোগার করে ফেলেছিলেন। এর ফলে তার নির্বাচিত হওয়া ছিল প্রায় নিশ্চিত, আমার ঠিক ততটা অনিশ্চিত। তবুও আমি নির্বাচিত হই, তিনি হননি। এটাই ১৯৭০ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে আন্তর্জাতিক আদালতের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য আমার পথ খুলে দিয়েছিলো। এভাবেই আমার মায়ের ৩৬ বৎসর আগে দেখা স্বপ্নটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছিলো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমি শুধু মাত্র বিশ্বের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধানই হইনি বরং আমিই একমাত্র ব্যক্তি যার মধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্টের পদ লাভ ও আন্তর্জাতিক আদালতের প্রেসিডেন্টের পদ লাভ দু'টোই ঘটেছিলো। সেই বিশেষত্ব আমার এখনো আছে। (১৯৮০ সনে এই বই প্রকাশের কাল পর্য়ন্ত)।

আমার মায়ের ঐ স্বপ্ন এই অভূতপূর্ব ভাবে পূর্ণ হওয়ার মধ্যেই আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের জোরালো প্রমাণ রয়েছে, আর সেই তথাকথিত সম্ভাবনা যে মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গে সরাসরি সংযোগ হতে পারে তথা তিনি তার বান্দার সঙ্গে কথা বলেন, এটা আর সম্ভবনার ব্যাপার রইল না, বাস্তব প্রমাণিত হলো। এটাও প্রমাণিত হলো যে তাঁর অপরাপর স্বপ্ন এবং আহমদীয়া জামাআতে তার অন্তর্ভুক্তির স্বপ্নও সত্য ছিল।

আল্লাহ্‌র অসীম কৃপায় আমি আন্তর্জাতিক আদালতের দায়িত্বাবলী কত ভালভাবে পালন করতে পেরেছিলাম তা আমার মায়ের স্বপ্নের বাস্তবায়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, তবু ঐ স্বপ্নের ভিতর তা অন্তর্নিহিত ছিল। যারা ঐশী বিষয়াবলীর ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী শুধু তারাই এর জটিল বিষয়গুলি বুঝতে সক্ষম হবেন।

এই বিশেষ স্বপ্নের বাস্তবায়নের খুটিনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে আমি মায়ের মৃত্যুর পরের অনেক ঘটনাবলী ইতিমধ্যে বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন আমি ১৯৩৪ সালের পর থেকে মার জীবনের ঘটনা বলব।

অনুচ্ছেদ–১১
পরম বিশ্বস্ততা ও সহানুভূতি

সময়ের সঙ্গে মা'র ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততা এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর পরিবারের সদস্যদের জন্য তার ভালবাসা ও অনুরাগ বেড়েই চললো। মা প্রায়ই বলতেন, তিনি যখনই কোন দোওয়া করতেন তার শুরুতেই তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিবারের প্রত্যেকের জন্য দোওয়া করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্র (দ্বিতীয় খলীফার) তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর জন্য ভালবাসারও কোন সীমা ছিল না। যখনই তাঁর কাছ থেকে কোন আদেশ-নির্দেশ আসতো তৎক্ষণাৎ তিনি তার উপর কাজ করতে শুরু করে দিতেন। খলীফা সাহেবও মাকে বিশেষ স্নেহভরে দেখতেন। একবার মা খলীফা সাহেবের সঙ্গে যেন নিজের ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন এমন অনুরাগভরে কথা বলতে লাগলেন। খলীফা সাহেবও মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনেছিলেন ও তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন।

মা একবার মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে স্বপ্নে দেখেন যেন তিনি বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। তারপর দূরে মাকে দেখতে পেয়ে বাবাকে বললেন, 'তাকে ডাকুন' বাবা যেন কাউকে বললে, 'জাফরুল্লাহ্ খানের মা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, দয়া করে ওখানে গিয়ে তাকে বলবেন যে, হযরত সাহেব তাকে আসতে বলেছেন।' এটা বুঝতে পেরে মা এগিয়ে এলেন এবং তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হুযূর আমি এখানে'। তাতে তিনি মাকে বললেন, 'মাহমুদকে (দ্বিতীয় খলীফা, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুত্র) বলবেন মসজিদের ব্যাপারে যেন খেয়াল রাখে।' মা এরপর এই স্বপ্ন আমাকে বললেন। 'মনে হয় জামাআতের সামনে কোন পরীক্ষা আছে।'

বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পর মা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)কে অনুরোধ করেন যে, 'যদি সম্ভব হয় তবে যেন বাবার কবরের পাশের জায়গাটুকু মায়ের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।' তিনি জনালেন যে সাধারণত আগে ভাগে এরূপ সংরক্ষণ করা হয় না, তবে বিশেষ ব্যতিক্রম হিসাবে তা করা সম্ভব। তিনি তাই বাবার কবরের ডানদিকের জায়গাটুকু মায়ের জন্য সংরক্ষিত রাখতে আদেশ দিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে কিছুদিন পরে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বড় ভাই মির্যা গোলাম কাদের সাহেবের স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এই চাচীকে ভুলক্রমে মায়ের জন্য সংরক্ষিত স্থানে কবর দিয়ে দেওয়া হয়। এর

কিছুদিন পর কাবুলের শহীদ হযরত সাহেবজাদা হযরত আব্দুল লতিফ খান এর একজন শিষ্য ও জামাআতের একজন বিশিষ্ট্য সদস্য আব্দুস সাত্তার খান আফগান ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বাবার ঠিক বাম দিকেই কবর দেওয়া হয়, মা যখন খলীফাতুল মসীহকে এ কথা জানালেন, তখন তিনি বললেন যে, 'কবরস্থানের কর্মচারীর ভুলে এরূপ ঘটেছে।' যা হউক এখন তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন বাবার কবরের সবচেয়ে কাছের প্রাপ্য জায়গাটি মায়ের জন্য অবশ্যই সংরক্ষিত রাখা হয় এবং রেজিষ্টারে তা যেন লিখে রাখা হয়। আরো জানালেন যে, এবারে সবচেয়ে কাছের যে জায়গাটুকু পাওয়া গেছে তা বাবার ঠিক পায়ের কাছে। মা আনন্দে বলে উঠলেন, 'আমার যোগ্য স্থান তো ঐটি।'

১৯৩৫ সালের মে মাসে গভর্ণর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যের দায়িত্বভার নেওয়ার জন্য আমরা সিমলা যাত্রা করি। সিমলা তখন ভারত সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। একই সময় আমার দীর্ঘ ২৫ বৎসরের এক বন্ধু সৈয়দ ইনামউল্লাহ্, যাকে মাও খুব স্নেহ করতেন, তার বিশেষ ব্যবসায়িক প্রয়োজনে দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদে রওনা হয়। এক পক্ষকাল পরে একটি টেলিগ্রাম এলো যে, সৈয়দ ইনামুল্লাহ্ গুরুতর অসুস্থ। আমরা আমাদের একজন বিশ্বস্ত কাজের লোক পাঠিয়ে দিলাম তাকে সাহায্য করার জন্য, আর নিজেরা তার আরোগ্যের জন্য দোয়ায় রত হয়ে গেলাম। মা আমাকে জানালেন যে, কয়েক দিন আগে মা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দেখেন যে একটি খোলা উঠানে তিনি, সৈয়দ ইনামুল্লাহ্ ও চৌধুরী বশীর আহমদ একসাথে বসে আছেন। হঠাৎ আমাদের চাচাত ভাই চৌধুরী জালালুদ্দিন একটি জানালা ফুঁড়ে আবির্ভূত হলো। মার মনে পড়ে গেলো যে, সে তো মারা গিয়েছে, তাই তাঁকে দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি চৌধুরী বশির আহমদকে ইশারা করে উঠে যেতে বললেন, এবং তারা দু'জন উঠে জানালা দিয়ে একটি ঘরে ঢুকে পড়লেন, যেখান থেকে উঠানটি দেখা যাচ্ছিলো। জানালা দিয়ে তিনি দেখলেন যে, চৌধুরী জালালুদ্দিন গিয়ে সৈয়দ ইনামুল্লাহ্'র সোফাতে পাশাপাশি বসলো। তার পর দু'জন একই চাদরে আবৃত হয়ে টানটান করে পা ছড়িয়ে আধা শোয়া হলো। মা যখন আমার কাছে এই স্বপ্ন বললেন, আমি তাকে বললাম যে, 'এই স্বপ্নের অর্থ তো স্পষ্ট। আপনি যদি আমাকে আগে এই স্বপ্ন বলতেন, তা'হলে আমি সৈয়দ ইনামুল্লাহকে হায়দ্রাবাদ থেকে শীঘ্রই চলে আসবার জন্য টেলিগ্রাম পাঠাতাম। যাক এখন তো আমাদের ওর জন্য দোয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

পরদিন আমি একদিনের জন্য দিল্লী যাই। দিল্লীতে আমি একটি রিডাইরেকটেড্ টেলিগ্রাম পাই যে ইনামুল্লাহ্ মারা গিয়েছে। যখন সিমলা ফিরে এলাম মা জিজ্ঞাসা করলেন ; 'ইনামুল্লাহ্'র কোন খবর পেলে?' আমি তাকে জানালাম যে সব শেষ হওয়ার খবর পেয়েছি। মা দারুন শোক পেলেন। তার আত্মার শান্তির জন্য দোয়া করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে ঠিক কখন মারা গিয়েছে?' আমি জানালাম যে আমি তো গতকাল টেলিগ্রাম পেয়েছি, তাহলে নিশ্চয়ই তার আগের দিন রাতে মারা গিয়েছে।

মা বললেন, 'তাই হবে, নিশ্চয়ই রাত তিনটার সময়। আমি তাহাজ্জুদের নামায শেষ করেছি, তখনো ফজরের অনেক সময় বাকী বলে বিছানায় শুয়ে তার আরোগ্যের জন্য দোয়া করেছিলাম। এমন সময় আওয়াজ হলো ঃ "তার বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে"। আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে তোমার স্ত্রীর ঘরে গেলাম এবং তাকে বললাম ইনামুল্লাহ্ মারা গিয়েছে।' আমরা যে কাজের লোকটিকে হায়দ্রাবাদ পাঠিয়ে ছিলাম সে যখন ফিরে এলো, তার কাছে জানলাম ইনামুল্লাহ্ তিনটার সময়ই মারা গিয়েছিলো।

১৯৩২ সালের ঘটনা। আমি তখন স্যার ফজলে হোসেন এর ছুটির সময়টাতে গভর্ণর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যের দায়িত্ব পালন করছি। লর্ড উইলিংডন তখন গভর্ণর জেনারেল। বাইস রিগাল লজের মেয়াদের এক অনুষ্ঠানে একদিন লেডী উইলিংডন মায়ের দেখা পেলেন এবং তার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে গেলেন। তারপর থেকে তিনি সব সময় তাকে 'মা' সম্বোধন করতেন। ১৯৩৫ সালে তাদের বন্ধুত্ব পূণর্জীবিত হয়েছিলো। একবার লর্ড ও লেডী উইলিংডন যখন সিমলায় আমার সরকারী বাসভবনে এসেছিলেন তখন আমাকে জানালেন যে, মা যদি ভাইসরয়ের সামনে যেতে আপত্তি না করে তাহলে তিনি মা'কে সালাম জানাতে আসতে চান। মা'র বয়স তখন বাহাত্তর বছর। পর্দার নিয়ম কানুনের কড়াকড়ি তার জন্য প্রযোজ্য ছিল না? কাজেই ভাইসরয়ের সাথে দেখা করতে তার অসুবিধা ছিল না। ভাইসরয় তাকে অভ্যর্থনা ও সালাম জানিয়ে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তার মতে কোনটি কঠিন কাজ, সম্রাজ্য পরিচালনা নাকি গৃহস্থালী পরিচালনা? কোন দ্বিধা না করে মা দৃঢ় কিন্তু শান্ত ভাবে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ্ তাআলা যেটাকে সহজ করে দেন।'

পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার হার্বাট ইমারসন ছিলেন খুব সমর্থ প্রশাসক, কিন্তু কিছুদিন আমাদের জামাআতের প্রতি মোটেই সহৃদয় ছিলেন না। এটা বুঝতে পেরে

আহরাররা জামাআতের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক মিছিল বের করতে শুরু করলো। আহরাররা ছিল এমন একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী যারা সামাজিক দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছিলো এবং ভেবেছিল বিনা বাধায় তারা এটা চালিয়ে যেতে পারবে। ১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মকালে একজন আহরার সমর্থক জামাআতের খলীফার ছোট ভাই সাহ্জাদা মির্যা শরীফ আহমদকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে আহত করে। এই মর্মান্তিক সংবাদে মা খুবই মনোকষ্ট পান। তিনি হযরত উম্মুল মু'মিনিনের উপর এর প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাই খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন ; এই গুরুতর ঘটনাটির কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। এটার ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারলাম না, তাই খুব খারাপ লাগে। এখন একটি উপায় চিন্তা করেছি, আমি অনেক দোয়া করেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এটা করতে সামর্থ দিবেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম; আপনি কি চিন্তা করেছেন'? তিনি বললে, 'তুমিতো জান লেডি উইলিংডন আমাকে কত ভালবাসেন ও কত সম্মান দেখান। এখন তুমি যদি একদিন ব্যবস্থা করতে পারো তবে ভাইসরয়ের সামনে লেডী উইলিংডনকে আমি জানাবো যে, পরিস্থিতির এতই অবনতি হয়েছে যে একটি দায়িত্বহীন যুবক প্রতিশ্রুত মসীহের সন্তানকে আঘাত করে বসে। আমি এখন অতি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। তাই আমার ক্ষেত্রে পর্দার কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল। আমার মনে এ বিষয়ে দারুন ক্ষোভ হয়েছে এবং এটা আমি ভাইসরয়কে জানাতে চাই।

মাকে বললাম : আপনি যেভাবে চাচ্ছেন সেরকম একটি সাক্ষাতের ব্যবস্থা আমি অবশ্য করতে পারবো। আমিও আপনার সাথে নিশ্চয়ই থাকবো, শুধু আপনার দোভাষী হিসাবে কাজ করার জন্য। যদিও আমি আগেই ভাইসরয়কে এ বিষয়ে আমার উদ্বেগ জানিয়েছি, তথাপি এবার আমি যাবো শুধু আপনার দোভাষী হিসাবেই। আমি নিজের কোন কথা কিন্তু বলবো না। যা বলতে হয় আপনাকেই বলতে হবে।

মা উত্তরে বললেন ; 'তোমাকে শুধু সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি নিশ্চিত যে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তখন ঠিক কি বলতে হবে সে জ্ঞান দিয়ে দিবেন।'

সেই সাক্ষাতের সময় লেডি উইলিংডন বসলেন একটি সোফায়। মাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বাঁ-দিকে বসালেন, তারপর মায়ের কোমর জড়িয়ে মাকে নিজের একদম কাছে টেনে নিলেন। ভাইসরয় লেডি উইলিংডনের ডান দিকে একটি হাতা ওয়ালা চেয়ারে বসলেন। আমি মায়ের বাঁ-দিকে আর একটি হাতা ওয়ালা চেয়ারে বসলাম। স্বাভাবিক সৌজন্য ও কুশল বিনিময়ের পর ভাইসরয় মাকে জিজ্ঞাসা

করলেন ; 'জাফরুল্লাহ্‌র কাছ থেকে জানতে পারলাম আপনি আপনার জামাআত সম্বন্ধে আমার কাছে কিছু বলতে চান।'

মা বললেন ; 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমি সরাসরি আপনার কাছে আসবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি আহমদীয়া আন্দোলনের একজন সদস্যা। প্রতিশ্রুত মসীহ্ আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন আমরা বৃটিশ সরকারের অনুগত থাকি ও এর জন্য প্রার্থনা করি। কেননা এই সরকারের অধীনে আমরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছি এবং কোন ভয়-ভীতি ছাড়াই ধর্ম পালনের সুযোগ পাচ্ছি। আমি আমার জামাআতের পক্ষ থেকে বলতে পারি না, তবে আমার নিজের পক্ষ থেকে এটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, মসীহের সেই নির্দেশ আমি পূর্ণভাবে পালন করে আসছি ও বৃটিশ সরকারের জন্য দোয়া করছি' (এ পর্যায়ে মা তার ডান হাত নিজের বুকে ঠেকালেন)। যা হোক গত দু'বছর ধরে পাঞ্জাব সরকার আমাদের জামাআতের প্রতি যে নির্দয় ও অন্যায় ব্যবহার করছে এবং যে ভাবে এই জামাআতের প্রধানকে ও অন্যদের কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তাতে করে যদিও এখনো আমি মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক এই সরকারের জন্য দোয়া করে যাচ্ছি, কিন্তু সেই দোয়া কোন ভাবেই আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে উঠে আসছে না। কেননা আমার অন্তর দারুন ভাবে ব্যথিত হয়ে আছে। মাত্র ক'দিন আগে এক যা তা সাধারণ লোক জামাআতের খলীফার ছোট ভাইকে আঘাত করে আহত করেছে। মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর বংশধররা আমাদের কাছে আমাদের নিজেদের চেয়েও প্রিয় ও আপন। যখনই আমি এ খবর পেলাম তখন থেকে আমার পানাহার ও ঘুম বন্ধ হয়ে গেছে।

মা'র শেষ কথাগুলো এতই আবেগ বহুল ছিল যে, লেডী উইলিংডন, যিনি সারাক্ষণ মার হাত চাপড়িয়ে দিচ্ছিলেন, আর থেমে থাকতে পারলেন না। প্রায় চিৎকার করে তিনি ভাইসরয়কে বললেন, 'এ সব কি হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনি কি করতে যাচ্ছেন'?

ভাইসরয় তাকে শান্ত করার জন্য বললেন ; জাফরুল্লাহর সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে আলাপ করেছি। তারপর মা এদিকে ফিরে একই রকম শান্তভাবে বললেন ; এ ব্যাপারগুলো প্রথমতঃ পাঞ্জাবের গভর্ণরের নিজের ব্যাপার। আমি তাকে সরাসরি এগুলোর জন্য কোন আদেশ দিতে পারি না। আমি যদি তা করি তা হলে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যখন আমি বোম্বের ও পরে মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলাম তখন যদি গভর্ণর জেনারেল আমাকে এ ধরনের ব্যাপারে আদেশ পাঠাতেন তখন আমিও তা প্রত্যাখ্যান করতাম। মা জবাব দিলেন, গভর্ণরকে আদেশ দেওয়া বা

বকা দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি না। তবে নিশ্চয়ই আপনি তার উপর তদারক করতে পারেন। কাজেই আপনি তাকে সুন্দর ভাবে উপদেশ দিতে পারেন এবং সৌজন্যের সাথে বলতে পারেন যেন তিনি আমাদের অভিযোগগুলোর ব্যাপারে মনোযোগ দেন ও তা দূর করার চেষ্টা করেন।

'নিশ্চয়ই আমি তা করবো' ভাইসরয় উত্তর দিলেন। লেডী উইলিংডনের রাগ কিন্তু এতো সামান্য কথায় পানি হলো না। তিনি মাকে শান্ত করার জন্য ও সান্তনা দেওয়ার জন্য সবরকম সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। এবার তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, মাকে আমার এই কথাগুলো বলে দিন, পাঞ্জাবের গভর্ণরকে আমি দেখে নেবো। তাকে আমি সমুচিত পাওনা দেবো।

১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসের ঘটনা। একদিন তাকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখে আমি তার দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। মা আমাকে বললেন যে আগের রাতে তিনি স্বপ্নে শুনতে পেলেন কে যেন বলছে আসাদুল্লাহ্ খান নিহত হয়েছে এবং সে বলে গেছে যে তার বড় ভাই যেন তার সন্তানদের দেখা শোনা করে। আমি মাকে শান্তনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। বললাম, স্বপ্নের কথা অনেক সময় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়। তাছাড়া দান খয়রাত ও দোয়ার দ্বারা অনেক বিপদাপদ কাটানো যায়। মা জানালেন, 'তিনি দান খয়রাত করেছেন ও আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছেন'।

দু'তিন দিন পর আসাদুল্লাহ্ খান আমাদের দেখতে দিল্লী এলো। আমাদের নাস্তার সময়েই সে এসে উপস্থিত। সবাই একসাথে নাস্তা করছি। এমন সময় কাজের ছেলেটি , যে তার বাক্সপেটরা খুলেছিলো, বিহ্বল ভাবে আমাদের কাছে এলো। তার হাতে ধরা একটি ভয়ঙ্কর দর্শন ছোরা আসাদুল্লাহ খানকে বললো যে তার গুটানো বিছানাটির মধ্য থেকে এটা পাওয়া গেছে। মনে হলো যেন আসাদুল্লাহ্ খান লজ্জায় পড়ে গেলো, যেন এটা আবিস্কার না হলেই ভালো ছিল। মা'র চোখে পড়ার ফলে মায়ের অস্বস্তি না ঘটানোই যেন ভালো হতো। কিন্তু এখন যখন সবাই দেখে ফেলেছে ও জানার আগ্রহ জেগে উঠেছে তখন বাধ্য হয়ে বললো। গতরাতে যখন আমি ট্রেনে করে আসি তখন বার্থে আমি এমন ভাবে বিছানা পেতে ছিলাম যে, আমার মাথা ছিল দরজার কাছে, পা ছিলো দরজা থেকে দূরে। সেভাবে আমি শুয়ে পড়ি ও ট্রেন ছেড়ে দেয়। প্রায় ঘন্টা খানেক পরে আমার মনে হলো আমার ঘুরে উল্টো ভাবে শোয়া দরকার। কাজেই আমার বালিশটা তুলে নিয়ে আমি দরজার দিকে পা দিয়ে শুয়ে পড়ি। রাতে শীত করছিলো বলে আমি চাদরটা ভালভাবে মুড়ি দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে

পড়ি। মাঝ রাতের দিকে আমার বেশ শীত লাগতে থাকে। তখন মনে হলো গায়ের চাদরটা সরে গেছে। তাই ওটা টেনে গায়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু দু'পায়ের ফাঁকে কিসের মধ্যে যেন আটকে থাকার ফলে আর টেনে গায়ে দিতে পারছিলাম না। ফলে উঠে বাতি জ্বালালাম এবং ছোরার গোড়াটি শক্তভাবে বিছানায় আটকে থাকতে দেখলাম। ভালভাবে খেয়াল করে দেখলাম একটি ছুরি আমার দু'পায়ের মাঝ বরাবর বিছানা চাদর ভেদ করে বার্থের চামড়ার ম্যাট্রেসের ভিতর শক্তভাবে গেথে আছে।

অস্ত্রটির আকৃতি দেখে বোঝা গেলো যে আততায়ীর পরিকল্পনাটি বেশ ভাবনা চিন্তা করেই করা হয়েছিল। আততায়ী লাহোর ষ্টেশন থেকেই তার শিকারকে লক্ষ্য রেখেছিলো, তারপর বার্থে শোয়ার ব্যবস্থা থেকেই নিশ্চিত হয়েছিল যে তার কাজটি খুব সোজা হয়ে গেছে। এখন তাকে শুধু মাঝখানের কোন ষ্টেশনে চুপে চুপে কামরার দরজা খুলে ঢুকে বুকের ঠিক মাঝখানে হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুরিটা বসিয়ে দিতে হবে। সে তাই করেছিলো এবং নিশ্চয়ই কল্পনার চোখে তার ইচ্ছা পূরণ হতে দেখছিলো যে তা শিকার কোন নড়াচড়া ও শব্দ না করেই ঢলে পড়েছে। সে জানতো না যে ঐশী কৃপায় তার শিকার কিছু পূর্বে স্থান পরিবর্তন করে শুয়েছিলো। ফলে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। ছুরিটা তার বুকে বিদ্ধ হয় নাই বরং দু'পায়ের ফাঁকে বিধেছিল, আর তার শিকার নিশ্চিত আরামেই ঘুমিয়েছিলো। এতে কোন সন্দেহ নাই যে তার মায়ের দান খয়রাত ও ঐকান্তিক দোয়া ও তার জন্য ঐশী কৃপা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলো। ১৯৩৬ সালের বসন্ত কালের কথা। লর্ড উইলিংডনের স্থলে লর্ড লিন্‌লিথগো ভারতের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল হয়েছেন। আহরার বিরুদ্ধ বাদীরা নির্বিচারে আহমদীয়া জামাআতের উপর তাদের নির্যাতন চালাচ্ছে। পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার হার্বাট ইমারসন এই আন্দোলনের প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নন। ১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মকালের শেষ দিকে আহরার-রা আমাদের পৈতৃক বাসস্থান দাস্‌কায় একটি কনফারেন্স করে। আমার সবচেয়ে ছোট ভাই সুকরুল্লাহ্ খান দাস্‌কায় বাড়ীতে থাকতো। মসজিদের সাথেই আমাদের বাড়ী ছিলো। কনফান্সের দিন সন্ধ্যায় একদল আহরার আমাদের মসজিদ ঘেরাও করে। আমাদের মুসল্লীরা যখন নামায শেষে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলো তাদের উপর এই আহরার গুন্ডারা চড়াও হয়ে লাঠি দিয়ে মারধোর চলালো। আমার ভাইও আহত হলো। মসজিদের সিঁড়ি তার রক্তে ভেসে গেলো। এরপরে আর এক দফা আক্রমণ হতে পারে ভেবে সে দৌড়ে খিড়কী দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে খিড়কী বন্ধ করে দিলো। দূর্বৃত্ত দলটি বাড়ীর

সামনের দিক দিয়ে এগিয়ে এলো। কিন্তু সামনের দরজাটি ছিল মোটা কাঠের, তাতে বড় বড় পেরেক দিয়ে আটকানো। তাদের প্রচেষ্টার কাছে দরজাটা যখন হার মানলো না তখন তারা পাশের সেই খিড়কীর উপর হামলা চালালো। খিড়কীর কাছে ভিতর দিকে বাড়ীর কয়েকজন যুবককে বসানো হয়েছিল। তারা চিৎকার করে দুর্বৃত্তদের সাবধান করলো যে খিড়কী দিয়ে মাথা গলালে তাদের মাথায় আঘাত করা হবে। দুর্বৃত্তদের চিৎকার ও রুদ্ররূপ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, যদি তারা বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পরতে সক্ষম হয় তবে আর বাড়ীর কোন পুরুষ মহিলা এমনকি বাচ্চাদের সম্মান, সম্ভ্রম ও জীবনের কোন নিরাপত্তা থাকবে না। এভাবে সম্পূর্ণ ঘেরাও অবস্থায় তারা অসহায় হয়ে পড়লো।

আমার ভাই পরিস্থিতির বর্ণনা ছোট্ট করে লিখে জীবন হাতে নেওয়া এক ছেলের দিয়ে থানায় পৌঁছে দিতে বললো। ছেলেটি বাড়ীর ছাদে উঠে লাফিয়ে পাশের বাড়ীর ছাদে গেলো। এভাবে সে পিছনের এক গলিতে চুপে চুপে নেমে পড়লো এবং থানায় গিয়ে কর্তব্যরত অফিসারের হাতে চিঠিটি দিলো। সেই অফিসার চিঠিটির উপর এক নজর বুলিয়েই কর্কশ ভাবে বলে উঠলো, মির্যায়ীদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এটাই তাদের প্রাপ্য ছিল।

মাঝরাতের দিকে হামলাকারী বিরক্ত হয়ে চলে গেলো। মা তখন আমার সাথে সিমলায় ছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই যখন তিনি এ খবর পেলেন তখন ভেঙ্গে পড়লেন। পুলিশের এই নির্দয় ও সাহায্য না করার মনোবৃত্তি আমাকে দারুন উদ্বিগ্ন করে তুললো। পুলিশের জেলা সুপার ছিলেন একজন কট্টর ধরনের মুসলমান। তার কাছ থেকে ভাল কিছু আশাও করতে পারছিলাম না। এই যখন অবস্থা আমি পাঞ্জাব সরকারের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক সদস্য স্যার রোনাল্ড বয়েডকে একটা চিঠি লিখলাম। সব ঘটনা বিবৃত করে আমি তাকে পরামর্শ দিলাম যে, ন্যায় বিচার ও শান্তির স্বার্থে জেলা পুলিশ সুপারকে অন্যত্র বদলি করা উচিত। স্যার রোনাল্ড বয়েড, একজন অনুগত ব্যক্তির মতই এই চিঠি স্যার হার্বার্ট ইমারসনের হাতে তুলে দেন। তিনি এটাকে দারুন মর্যাদা হানিকর বলে মনে করলেন এবং সরাসরি ভাইসরায়ের কাছে নিয়ে এসে বললেন যে এতে তার পুলিশের উপর আস্থার অভাব দেখানো হয়েছে এবং তাতে করে তার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। তিনি প্রস্তাব করলেন এই অভিযোগগুলির ব্যাপারে তিনি একটি প্রকাশ্য অনুসন্ধান (পাবলিক ইনকোয়ারী) বসাতে চান, যাতে করে সব ব্যাপার পরিস্কার হয়ে যায়।

আমি যখন সাপ্তাহিক সাক্ষাতকারে ভাইসরয়ের সাথে মিলিত হলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি স্যার রোনাল্ড বয়েডের কাছে কোন চিঠি লিখেছি কি না। আমি তাকে বললাম যে, হ্যাঁ, এবং এর পটভূমি বললাম। তখন তিনি গভর্ণর যে প্রস্তাব করেছিলো তা আমাকে বললেন এবং এও বললেন ; 'আমি তাকে গভর্ণর জেনারেল হিসাবে প্রকাশ্যে অনুসন্ধান বসাতে নিষেধ করে দিয়েছি।'

আমি বললাম ; এসব শুনে আমি খুব দুঃখ পেলাম। আমরা তো আমাদের জামাআত ও পাঞ্জাব সরকারের মধ্যে যে ভুল বুঝা-বুঝির সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে একটি প্রকাশ্য অনুসন্ধানকেই স্বাগত জানাতাম। তা হয়তো আবহাওয়াটাকে পরিস্কার করতো। গভর্ণর আমাদের জামাআত সম্বন্ধে যে আশংকা করেন তা যদি আমরা দুর করতে সমর্থ হতাম, তা'হলে তিনি হয়তো আমাদের ব্যাপারে তার মনোভাব পরিবর্তন করতেন। অন্যদিকে আমাদের উপর নির্দয় আচরণ করা হচ্ছে বলে আমাদের যে অভিযোগ তাও যদি ভুল ধারণা-প্রসূত বলে প্রমাণ হতো, তাহলে আমাদের মনেও শান্তি পেতাম। যাহোক আমি চাই না এসবের কারণে আপনি কোন বিরূপ পরিস্থিতিতে মুখোমুখি হন। তাই আমি এখনই পদত্যাগ করছি ও ঐ অনুসন্ধানে আমার জামাআতের পক্ষে কাজ করবো।

ভাইসরায় বললেন ; 'আপনার এই মনোভাব প্রশংসনীয়, আর আপনি যে কি কঠিন অবস্থায় আছেন তাও আমি বুঝতে পারছি। আপনার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আমি গভর্ণরকেও বলে দিয়েছি, যাই কিছু বলা হউক বা ঘটুক না কেন আমি আপনার কথাকেই চূড়ান্ত সত্য বলে ধরে নেবো। কাজেই পদত্যাগের ব্যাপারে ব্যস্ত হবেন না। যতদিন আপনি আপোষহীন চলতে পারছেন ততদিন কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন। আপনি আমার পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি পাবেন। আমার পরিবারকেও এক দীর্ঘ সময় নির্যাতনের ভেতর দিয়ে পার হয়ে আসতে হয়েছিলো। আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে যে দূর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেলো তার ব্যাপারে বিচার বিভাগের একটি শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।

আমি জানালাম ; আপনার এই সহানুভূতি ও আমাকে বুঝতে পারার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমরা এখন যে অবস্থায় আছি তাতে দোয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। আমরা সেই দুয়ারই আশ্রয় চাইবো।

পুলিশের সেই কথিত অনুসন্ধানের ফল ছিল এই যে, এক মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগে উল্টো দাস্কার সকল আহমদী পুরুষদেরই অভিযুক্ত করা হলো।

দাস্‌কার সাকুল্য এগারোজন আহমদী পুরুষকে আহরারদের কনফারেন্সে গন্ডগোল ও যোগদানকারীদের আহত করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। মা এতে নিদারুন আঘাত পান ও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এই অভিযুক্তরা মায়ের প্রচারের ফলেই এই জামাআতে যোগ দিয়েছিলো। তাই মা এখন এদের প্রতি একটি বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করলেন। এদের জন্য মায়ের দোয়া চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করলো। এই কেসের বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন একজন অ-মুসলমান। তিনি পুলিশের এক আর্জিতে সন্দেহ করে বসলেন এবং কোথাও কোন ঘাপলা আছে বলে অনুমান করলেন। এতে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের আগ্রহ জেগে উঠলো। ফলে যখন সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হলো তিনি সুক্ষ্মভাবে সবকিছু তলিয়ে দেখলেন। কাজেই কেস যতদিন চলতে থাকলো ততই তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত বিচারক দেখতে পেলেন যে এই কেসটি একগাদা মিথ্যার বেসাতী ছাড়া আর কিছু নয়। যে সব লোককে সাক্ষী সাবুদ বানানো হয়েছিল তাদের বক্তব্য লিখার পরই এক আই আর লিখা হয়েছিলো, যাতে সব কথাগুলো ঠিকমত মিলে যায়। যেখানে কনফারেন্স হয়েছিল তার চতুর্সীমায় একমাইলের মধ্যে কোন অভিযুক্ত সেদিন যায়নি। বিচারক অভিযুক্তদের সবাইকে বেকসুর খালাস দিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে কড়া করে লিখলেন। কেসের ফলাফলে স্যার হার্বাট ইমারসন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তিনি পুলিশের একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলকে নিযুক্ত করলেন, যাতে তদন্ত করে দেখা হয় যে ম্যাজিষ্ট্রেটের মন্তব্য কতদূর যুক্তিযুক্ত। এখন ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেই বাধ্য হলো আত্মরক্ষা করতে। ফলে তার বক্তব্য যখন নেওয়া হলো, তাতে তিনি পুলিশের মুখোস পুরোপুরি খুলে দিলেন। কাজেই ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল তার রিপোর্টে জানালেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের বক্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ছিলো।

মা কেসের ফলাফলে খুব আনন্দিত হলেন। আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীর শুকরিয়া জ্ঞাপনে তার হৃদয় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে গেলো। প্রাইভেট সেক্রেটারী মারফত ভাইসরয় যখন এ সংবাদ শুনলেন তখন তিনি মন্তব্য করলেন যে তাকে (জাফরুল্লাকে) ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছিলো।

১৯২৬ সালে আমি বিয়ে করেছিলাম। বেশ অনেক বৎসর ধরে আমাদের কোন সন্তানাদি হচ্ছিল না। আমার ডাক্তার যে, মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীরও সামান্য অসুখ বিসুখের চিকিৎসা করতো, আমাকে বলতো আমার স্ত্রীর নাকি সন্তান

ধারণের ক্ষমতা নেই। একবার সে আমাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে বলেছিলো। আমি তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলাম এই বলে; আল্লাহ্‌র দয়া থেকে কারো নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কিছু দিন পর আবার ব্যাপারটা উত্থাপন করলো এবার সে তার ডাক্তারীমতের লক্ষণগুলোর বর্ণনা দিয়ে বললো 'আমি আমার পেশার বাজী ধরে বলছি যে তোমার স্ত্রী কোন দিন সন্তান ধারনে সক্ষম হবে না'।

১৯৩৬ সালের ঘটনা। মা রাতে স্বপ্নে দেখেন যে একটি কাজের ছেলে ট্রেতে করে পাঁচটি আম, পাঁচটি টাকা ও একটি সোনার নাকফুল নিয়ে এলো। বললো, এটি আমার বাবার পক্ষ থেকে উপহার হিসাবে পাঠানো হয়েছে। মা আশ্চর্য হয়ে বললেন ; এটাইতো সেই ফল যা তিনি পাকলে পরে ট্রেতে করে নিয়ে আসবেন বলেছিলেন'। পরদিন সকালে মা আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সন্তান ধারনের কোন লক্ষণ নিজের মধ্যে বুঝতে পারছে কি না। আমার স্ত্রী বললো যে, না এমন কিছু সে বুঝতে পারছে না। মা উত্তরে মন্তব্য করলেন ; 'তুমি হয়তো তাই বলবে। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে নিশ্চিত সংবাদ দিয়েছেন যে একটি সন্তান আসছে। আর আমার কোন সন্দেহ নাই যে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তা সত্য করে দেখাবেন'।

আসলে আমার স্ত্রীর গত মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, আর তার লেডী ডাক্তারও বলেছিলেন যে তার বাচ্চা হবে। কিন্তু সে চাচ্ছিলো মাকে এই সুসংবাদ দেওয়ার আগে আরো নিশ্চিত হয়ে নিতে। একজন মহিলা ধাত্রী বিদ্যা বিশারদ তাকে নিয়মিত পরীক্ষা করতো, সে জানালো যে আমার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দিলো। কিন্তু তথাপি আমার স্ত্রী তা আমাদের জানালো না। তার চতুর্থ পরীক্ষার পর আমার স্ত্রী মার কাছে গিয়ে বললো ; এখন আপনি আমার স্বামীকে খবরটি দিতে পারেন। মা ও আমি দু'জনেই সংবাদটি পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলাম।

পরে আমার সেই ডাক্তার যখন দিল্লী থেকে এলো এসেই জানালো যে দিল্লীর আমার অমুক বন্ধুর প্রতিদিন জ্বর হচ্ছে। কাজেই আমি যেন তাকে ছুটি নিয়ে সিমলা চলে আসতে বলি। এখানে ঠান্ডায় যেন সে কিছু দিন অবস্থান করে যতদিন তার জ্বর ভাল না হয়। সে আরো বললো, এই পর্যায়ে সে যদি যত্নবান না হয় তাহলে পরে টিবি হতে পারে। কিন্তু বন্ধুটি নাকি এতে কোন কান দেয় নাই।

আমি ডাক্তারকে বললাম, তিনি হয়তো অতিরিক্ত ভয় পাচ্ছেন।

"না আমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমি আমার পেশাগত সুনামের বাজি ধরে এটা বলতে পারি।"

"আমি জানি আপনি এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। কিন্তু আপনি যখন তখন সময় অসময় আপনার পেশাগত সুনামের বাজি ধরতে বেশী ভালবাসেন। আমাকে ক্ষমা করবেন আমি আপনার পেশাগত সুনামের আর দু'কড়ি মূল্য দেই না।"

"কেন, কি কারণে আপনি এ কথা বললেন।"

"আপনি আপনার পেশাগত সুনাম বাজি রেখে বলেছিলেন,আমার স্ত্রী সন্তান ধারণে সক্ষম হবে না।"

"হ্যাঁ নিশ্চয় বলেছি, এবং এখন আবার আরো জোরের সাথে বলছি। তার গর্ভথলী সম্পূর্ণ শূকনো এবং অকার্যকারী। এটা অসম্ভব।

"আসুন, উপরে চলুন, তাকে পরীক্ষা করে দেখুন।"

পরীক্ষা করতে দু'মিনিটও লাগলো না। সম্পূর্ণ ফ্যাকাশে মুখে কাঁপতে কাঁপতে তার ঘর থেকে ডাক্তার বেরিয়ে এলো। মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার। আমি এটার ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

গর্ভাবস্থা স্বাভাবিক ভাবেই কেটেছিলো, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আমরা সিমলা থেকে দিল্লী চলে এলাম। ১২ই জানুয়ারী একটি আশীসপূর্ণ দিন। এ দিনেই প্রতিশ্রুত মসীহের প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত সাহেবজাদা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, জামাআতের দ্বিতীয় খলীফা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মা সকালে আমার স্ত্রীকে বললেন, আজ একটি মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ট হবে। মা স্বপ্নে দেখেছেন যে, একদল উৎফুল্ল মানুষ বলছে বাচ্চাটির জন্ম হয়েছে, খুব সুন্দর মেয়ে।

তা সত্যিই প্রমাণিত হলো। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) (জামাআতের দ্বিতীয় খলীফা) তার নাম রেখেছিল আমাতুল হাই। এই মেয়ের পাঁচটি সন্তান হয়েছে। চারটি ছেলে একটি মেয়ে। তার নিজের আগমন ছিল মায়ের জন্য সবচেয়ে আনন্দ উৎসবের ব্যাপার। মা কত সাধনা ও প্রার্থনা করেছেন এই ঐশী ফলের জন্য।

অনুচ্ছেদ–১২
বিবিধ

ঐশী ব্যাপারে মা'র অভিজ্ঞতা ছিল বিভিন্নমুখী। তাতে বোঝা যেতো যে, মা ছিল অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন মহিলা। তবু তিনি কোনদিন আধ্যাত্মিকতায় সাফল্যের কোন দাবী করতেন না। আসলে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী 'মাটির উপর চলাফেরা করতেন বিনম্রভাবে।' (২৫ ঃ ৫৪) আল্লাহ্‌র প্রতি তার ছিল সুদৃঢ় আস্থা, সব সময় তাঁর করুণা ও দয়ার উপর তিনি নির্ভর করতেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি ছিল তার অপরিসীম দরদ, কাউকে তিনি বড় ছোট দেখতেন না। এতোসব গুণ সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বেশ রসিকা। মা আমাকে খুব গভীর ভাবে ভাল বাসতেন কিন্তু যখন কোন ব্যাপারে বকা দেওয়া উচিত মনে করতেন তখন বকা দিতে মোটেও দ্বিধা করতেন না। কয়েকটা ঘটনা তার চারিত্রিক গুণাবলী ও আল্লাহ্‌র সাথে তার সম্পর্ক খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

আমার ছোট ভাই আসাদুল্লাহ্ খান যখন প্রাইমারী স্কুলে পড়তো তখন সে তার লেখার শ্লেটের ব্যাপারে খুব অমনোযোগী ছিল। কিছুদিন পর পর তার শ্লেট হারিয়ে যেতো, না হয় ভেঙ্গে যেতো। একবার মা তাকে খুব করে বকা-ঝকা করেন, ফলে সে খুব লজ্জিত হয়। সেই রাত্রে মা স্বপ্নে দেখেন, এক সুন্দর সৌম্য দর্শন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিকে, যার চেহারা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তিনি মাকে বললেন, তুমি 'অযথাই আমার এক বান্দার প্রতি সামান্য চার আনা পয়সার ব্যাপারে দূব্যবহার করছো। এই নাও চার আনা পয়সা, বলে তিনি একটি নতুন চকচকে চার আনা মার হাতে দিলেন।

রাতের শেষ দিকে মা নামাযের জন্য ওজু করতে এক বদনা পানি নিয়ে ঘরের বাইরে চন্দ্রালোকিত উঠানে নেমে এলেন। তখন তিনি দেখলেন যে একটি ছোট, চকচকে বস্তু আকাশ থেকে নেমে আসছে। বস্তুটি এসে বদনার সঙ্গে ঠক্ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। মা ওটা তুলে নিয়ে দেখলেন যে ওটা একটি রূপার চার আনি। খুব যত্ন করে মা সেটা তুলে রেখেছিলেন। কিছুদিন পর ভুলক্রমে ওটা হারিয়ে যায়।

১৯১০ সালে মা একবার স্বপ্নে দেখেন, তিনি তার ভাগ্নিকে নিয়ে একটি গাড়ী চালিয়ে শিয়ালকোট কেন্টনমেন্ট এলাকা দিয়ে যাচ্ছেন। যখন একটি গীর্জার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখেন একটি বড় পাথর ঐ গীর্জার চূড়া থেকে খসে পড়ছে এবং

জায়গাটি ফাঁকা হয়ে আছে। মা তার ভাগ্নীকে দেখিয়ে বললো, 'দেখো ঐ ফাঁকা জায়গাটা দেখতে কেমন খারাপ লাগছে'। ভাগ্নিকে আবার দেখালো কাছেই কিছু রাজমিস্ত্রী ঐ রকম একটি পাথর তৈরী করতে ব্যস্ত আছে ওটা তৈরী হয়ে গেলেই ঐ রকম ফাঁকা জায়গাটা পূর্ণ করে ফেলা হবে। এর কয়েকদিন পরেই খবর বেরুলো যে গ্রেট বৃটেনের রাজা সপ্তম এ্যাডওয়ার্ড মারা গেছেন, তার স্থলে তার পুত্র পঞ্চম জর্জ রাজা হয়েছে।

বিয়ের সময় গ্রাম দেশে বিশেষত ঃ পঞ্জাবে যে সমস্ত বাহুল্য আনুষ্ঠানিকতা ও নিস্ফল নিয়ম কানুন পালন করা হতো সেগুলোকে মা খুব ঘৃণা করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বর ও কনেকে প্রথম দফায় পরস্পরের সাথে দেখা করানোর সময় তাদেরকে পরস্পরের মুখোমুখি বসানো হতো, চারদিকে ভীড় করে থাকতো বিয়ে বাড়ীর সব মহিলারা। তারপর দু'জনের মধ্যে কতগুলো বাজে মূল্যহীন খেলার প্রতিযোগিতা করাতো। চৌধুরী বশির আহমদের বিয়ের সময়ও এটা ঘটলো তাকে মহিলাদের ভীড়ে গিয়ে এই খেলায় বসতে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। সে পুরো ব্যাপারটাকেই বাজে মনে করতো, তবু ঝামেলা সৃষ্টি না করার জন্য তাকে যেখানে বসতে বলা হলো সেখানে সে বসে পড়লো। যে সব জিনিস দিয়ে খেলানো হবে সেগুলোর দিকেও সে যথারীতি নিজে থেকেই হাত বাড়িয়ে দিলো। হঠাৎ তার কব্জিতে মায়ের শক্ত হাত এসে ধরলো, তারপর সেটাকে ঠেলে দিলো। বললেন, 'না বৎস, তুমি এই নিরর্থক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাড়ামীতে যেতে পারো না। বশির আহমদ তো যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলো। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দিয়ে সে কেটে পড়লো।

সৈয়দ ইনামুল্লাহ্ খুব ভোজন রসিক ছিল। অনেকটা লোক দেখানোর ছলেই সে অনেক সময় ইচ্ছা করে খাওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ফেলতো। মা তার এই স্বভাব জানতেন। কাজেই তাকে লাই দিয়ে আনন্দ পেতেন। একবার সে শিয়ালকোট থেকে আমাকে দেখতে দাস্কা এলো। যখন আমি দাস্কায় থাকতাম প্রায়ই সে এভাবে আমাকে দেখতে আসতো। দুপুরের খাওয়ার সময় কাজের ছেলেটি আমাদের দু'জনের জন্য খাবার নিয়ে বাহিরের পুরুষদের ঘরে এলো। কাজের ছেলেকে ট্রেতে করে খাবার নিয়ে আসতে দেখেই ইনামুল্লাহ্ লাফ দিয়ে নিজের জায়গা থেকে উঠে খাবার টেবিলে গিয়ে বসে চিৎকার জুড়ে দিল, 'জলদি নামাও, জলদি নামাও'। তারপর হাত বাড়িয়ে ট্রেতে ধরে দিলো ঝাঁকি ফলে খাওয়ার প্লেটগুলো ঝনঝন করে উঠলো। কাজের ছেলেটা বিব্রত হয়ে এটাকে অসভ্য আচরণ বলেই মনে করলো। আমি ইনামুল্লাহকে বললাম যে, আমি তার

সঙ্গে খেতে বসছি না, বরং ভিতরে গিয়ে মায়ের সঙ্গে খাবো। সে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেলো ও বেশ দুঃখ পেলো। কিন্তু বেশ বিরক্ত ছিলাম, তাই ভিতরে চলে গেলাম। মা যখন আমাকে দেখলেন, বললেন, 'আমিতো খাবার পাঠিয়ে দিয়েছি'। আমি বিড়বিড় করে বললাম, আপনার সঙ্গে খাবো।

"ওহো বুঝতে পেরেছি, ইনামুল্লাহ্ নিশ্চয় কোন মস্করা করেছে আর তুমি বিরক্ত হয়েছো। কিন্তু বাছা, তুমি তো তার স্বভাব জানই, সে না তোমার বন্ধু? মনে রেখো, বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী ব্যাপার, তুমি যদি বন্ধুত্ব কর তবে তা চিরদিন চালিয়ে যাবে আর না হয় এরূপ বন্ধুত্ব আদৌ শুরু করবে না। তোমার এই তড়িৎ বলগাহীন কাজের জন্য নিশ্চয়ই তোমার বন্ধুকে তুমি আঘাত দিয়েছো। এখন তার কাছে ফিরে যাও আর তাকে বলো তোমাকে মাফ করতে। তারপর তাকে সান্ত্বনা দাও।"

আমি বিমর্ষবদনে বসে থাকা ইনামুল্লাহ্‌র কাছে ফিরে এলাম, তার কাছে মাফ চাইলাম। সে আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলো, 'আমি নিশ্চিত জানতাম মা তোমাকে ঠিক ফেরত পাঠাবে'।

আর একটি ঘটনা, তখন আমি বেশ ক'বছরের অভিজ্ঞ ব্যারিষ্টার। ১৯৩০ সালের শরত কালে যখন প্রথম গোল বৈঠকের ব্যাপারে লন্ডন ছিলাম তখন লাহোর হাইকোর্টের একটি রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভী কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটিতে আপীল করা হয়। লন্ডনের একটি সলিসিটর ফার্মকে আমিই নিযুক্ত করে দিয়েছিলাম। একদিন সেই সলিসিটর আমাকে ফোন করে বললো, আমি যদি জুনিয়র কাউন্সেল হিসাবে আপীলকারীর পক্ষ থেকে ঐ শুনানীতে উপস্থিত হই তাহলে সেটা আমার জন্য একটা ভাল অভিজ্ঞতা লাভ হবে। ফি নেওয়ার কোন প্রশ্ন ছিল না। শুনানীর দিন তিনি আমার জন্য প্রয়োজনীয় রোবস (ঐ আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষ পোষাক) নিয়ে এলেন। শুনানীতে উপস্থিত হওয়ার আগে সিনিয়র কাউন্সিলের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নিলাম। সেই বোর্ডের সভাপতিত্ব করছিলেন লর্ড ব্লানেস বার্গ। তিনি ছিলেন আপীলের জন্য স্কটল্যান্ডের একজন লর্ড। শুনানী শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার সিনিয়র কাউন্সেলর অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেলো। যখন তিনি আর বোর্ডের সদস্যদের তোলা আপত্তিগুলোর কোন সদুত্তর বা ব্যাখ্যা দিতে পারছিলেন না, তখন লর্ডগণ তাদের ফাইল পত্র বন্ধ করে দিতে শুরু করলো। আমি মনে মনে বুঝতে পারছিলাম, এই আপত্তিগুলোর উত্তর আমি জানি। কিন্তু পরিস্থিতি যে পর্যায় পৌঁছেছে তাতে কি করবো বুঝে উঠতে পারলাম না। লর্ড ব্লানেসবার্গ আমার

উসখুস অবস্থা দেখে বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন'। আমি বললাম, আমি চেষ্টা করছি, এই বলেই আমি যুক্তি পেশ করতে শুরু করে দিলাম। লর্ডগণ আমার বক্তব্যে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং আমাকে প্রত্যেক পদে উৎসাহ দিতে লাগলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম যে যখন তাদের আপত্তিগুলির উত্তরে সমস্যার বেড়াজালগুলো যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে আমি খুলে দিচ্ছিলাম তখন তারা এটাকে বুদ্ধিমত্তার এক পরীক্ষা বলেই ধরে নিলেন। শেষ পর্যন্ত ফল হয়েছিলো এই যে, আমাদের আপীল গ্রহণ করা হয়েছিলো।

কয়েকদিন পর এক ভোজসভায় লর্ড ব্লানেসবার্গের সাথে আমার দেখা হয়ে যায়। অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন 'এই যে সেই যুবক ঐ দিন প্রিভি কাউন্সিলে যে আমাদের অজ্ঞানতাকে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে দুর করে দিয়েছিলো। তারপর আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে অতিথীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। তারপর একদিন সকালের নাস্তার ও তারপর একদিন রাতের ভোজে আমাকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন। এভাবে তার ও আমার মধ্যে এক সুহৃদ সূলভ বন্ধুত্বের সূচনা হলো, যার ইতি ঘটেছিলো ১৯৪৬ সালে, ৮৫ বৎসর বয়সে তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। তার সঙ্গে যে সময়টুকু কাটিয়ে ছিলাম সবটাই ছিল এক বিরাট সুযোগ ও শিক্ষা। আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে, তিনিও মায়ের দারুন ভক্ত, যেটা আমাদের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করণের অন্য একটি কারণ ছিলো। আমাদের যখন প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি গোল্ডস্মিথ কোম্পানীর সর্বোচ্চ রক্ষক ছিলেন। সেই পদাধিকার বলে তিনি একদিন আমাকে কোম্পানীর তরফ থেকে দেয়া এক কোর্ট ডিনারে আমন্ত্রণ জানান, যা আমি খুব উপভোগ করেছিলাম। আমার ফিরে আসার কিছু দিন পর মা দারুন সুন্দর একটি প্লেট উপহার পান। গোল্ডস্মিথ কোম্পানীর বিশেষভাবে তৈরী এ প্লেটটি পাঠিয়ে ছিলেন লর্ড ব্লানেসবার্গ। ঐ প্লেটে সুন্দর করে খোদাই করে লিখা ছিল ঃ

ঃ ইংল্যান্ড থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলী ঃ

'একজন প্রখ্যাত ভারত সন্তানের নিবেদিত-প্রাণ ভারতীয় মায়ের প্রতি'

ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য লন্ডন যাওয়ার প্রক্কালে মাকে বললাম, এবার লর্ড ব্লানেসবার্গকে তারতো কিছু উপহার পাঠানো দরকার। মা বললেন, 'তুমি কি পাঠানো বলে উচিত মনে কর'? আমি বললাম, তোমার একটি ছবি। মা হতভম্ব হয়ে বলে

উঠলেন, 'এক বৃদ্ধা মহিলার ছবি দিয়ে তিনি কি করবেন?' আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম যে, তাতেই তিনি সবচেয়ে বেশী সম্মানিত বোধ করবেন।

এই ব্যাপারে আমার অবশ্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। মা'র বয়স তখন ছিষট্টি বৎসর। তখন পর্যন্ত তার কোন ছবি আমাদের কাছে ছিল না। এই কৌশলে আমরাও তার একটি ছবি পেয়ে যাবো। মা অবশ্য দু'টো শর্তে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে রাজী হলেন। প্রথমত তিনি ছবি তোলার জন্য কাপড় বদলাবেন না। অন্য কাপড়ও পরবেন না এবং দ্বিতীয়ত সেই ঘরে আমি তার সঙ্গে উপস্থিত থাকবো। ছবিটি বাঁধাইয়ের জন্য আমি খুব সাধারণ কিন্তু রুচিসম্মত ফ্রেম কিনলাম, আর কিনলাম মানানসই একটি টেবিল ও ছোট ইরানী গালিচা, যাতে তিনটি মিলিয়ে ঘরের মধ্যমনি হিসাবে খুব সুন্দর একটি উপঢৌকন হয়। লর্ড ব্লানেসবার্গ এতে অত্যন্ত খুশী হয়ে ছিলেন।

১৯৩১ সালের গ্রীষ্মকালে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার সিনিয়র ক্রাউন কাউন্সেল হিসাবে আমি দিল্লীতে ছিলাম। মাও আমার সঙ্গে ছিলেন। সে বৎসর খুব খরা হয়েছিলো। ফসল মোটেই ফলেনি, মা খুব ব্যথিত হলেন, 'গরীব' চাষীরা কিভাবে চলবে? তাদের জন্য আমরা কি সাহায্য করতে পারি? আমি তাকে বললাম, তিনি যা ইচ্ছা করবেন সে ভাবেই তাদের সাহায্য করা হবে। এতে তিনি কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, যাদের আমরা চিনি যে, তারা সত্যি অসুবিধার মধ্যে আছে তাদেরকে আর্থিক সাহার্য দেওয়া হউক। আমি রাজি হলাম। তিনি নিজে নামগুলি সংগ্রহ করে বলে দিলেন। তাতে কাকে কত দেওয়া হবে তার তালিকাও তৈরী করা হলো।

মা আমাকে বললেন, 'এটা তোমার উপর বেশী বড় বোঝা হবে না তো?' আমি তাকে জানালাম যে যাতে তিনি খুশী হন তেমন কোন কিছু আমার জন্য কখনো বোঝা নয়। আসলেও পুরো টাকাটা আমার জন্য বেশী বোঝা স্বরূপ ছিল না। আমি সহজেই তা খরচ করতে পেরেছিলাম। সে দিনই মানি অর্ডার তাদের যার যার নামে পাঠানো হলো। মা আমার জন্য দোয়া করলেন। তার হাসিও আমার জন্য ছিল এক আশির্বাদ।

১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মকালে যখন পাঞ্জাবের গভর্ণর ছুটিতে যান তখন পাঞ্জাব সরকারের রেভেন্যু মেম্বার স্যার সিকান্দার হায়ত খান গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করেন। তার দায়িত্ব পালনের শেষ দিকে তিনি ঠিক করলেন যে গভর্ণর ফিরে এলে তিনি নিজেই ছুটিতে যাবেন। তিনি গভর্ণরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার অবর্তমানে কে রেভিন্যু মেম্বার হিসাবে কাজ করবে। তাতে গভর্ণর আমার নাম

বললেন। স্যার সিকান্দার সিমলা থেকে আমাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সময় দিতে পারবো কি না। আমি তাকে বললাম, গ্রীষ্মকালে আমার অন্য একটি পরিকল্পনা আছে। তাতে তিনি বললেন, 'আপনি তো সামনের সপ্তাহে সিমলা আসছেন'। তখন আশা করি আমি আপনাকে বোঝাতে সমর্থ হবো।

মাকে এই ব্যাপারটা বললাম। তার প্রতিক্রিয়া ছিল তড়িৎ ও সুনির্দিষ্ট ঃ 'না বাছা আমার মনে হচ্ছে স্যার সিকান্দারের স্থলে আমাদের কাজ করা উচিত হবে না। কাজেই এটাই ছিল চূরান্ত কথা। আমি বিশেষভাবেই সেই 'আমাদের' কথাটির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলাম। আর যেই সুরে তিনি কথা ক'টি বলেছিলেন তাতেই ধরে নিয়েছিলাম যে তার ছেলের জন্য ঐটি খুব ভাল কিছু হবে না।

গভর্ণর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি ১৯৩৫ সালের মে মাসে। তখন আমরা সিমলা চলে যাই। সেই সময় পাঞ্জাবের কিছু কিছু মুসলমান মেয়ে যারা নিজেদের প্রগতিশীল মনে করতো, তারা পর্দা ত্যাগ করলো। তাদের দেখা দেখি আরো অনেকেই এদিকে এগিয়ে আসছিলো। এই প্রগতিশীলদের মধ্য থেকে দু'জন যুবতি, যারা আমার স্ত্রীর খুব পরিচিত ছিলো, তারা আমার স্ত্রীর কাছে এলো। কিন্তু তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে আমার স্ত্রীকে রাজি করতে না পেরে তারা একদিন মার কাছে এসে অনুরোধ করলো যেন তিনি তাকে পর্দা ত্যাগ করতে বলেন। মা বললেন, 'আমি এরূপ করতে বলতে পারি না। তা হবে আমাদের আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশের বরখেলাফ'। তারা বললো, 'আপনি কেন আমাদের আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল বলেছেন?' তাঁরা কি আমাদের আল্লাহ্ ও রসূল নন? মা জবাব দিলেন, ভাল কথা, তোমরা যদি তাই বল তাহলে তাঁদের আদেশ মেনে চল।

১৯৩৫ সালের ৩১শে মে তারিখে কোয়েটায় প্রচন্ড ভূমিকম্প হলো, তাতে প্রচুর জানমালের ক্ষতি হয়। আমি ছিলাম বাণিজ্য ও রেলওয়ে মন্ত্রী। আমি রেলওয়ে বোর্ডকে বললাম যে, সরবরাহ ও স্থানান্তরের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা যেন করা হয়। রেলওয়ে খুব ভাল কাজ দেখিয়ে প্রচুর প্রশংসা পায়। কিছু দিন পর রেলওয়ে চীফ কমিশনার স্যার গুথারি রাসেল ও চীফ কন্ট্রোলার অব ষ্টোরস স্যার জেমস পিটকিয়েথলী আমাকে বলল যে, সরেজমিনে দেখার জন্য আমাদের একবার কোয়েটা যাওয়া দরকার। মা-ও ঠিক করলো আমাদের সঙ্গে যাবে। কোয়েটা থেকে ফেরার পথে আমরা 'ছাপ্পর রীফ্‌ট' হয়ে ফিরতে পারি তার ব্যবস্থা করা হলো। 'ছাপ্পর রীফ্‌ট' হলো রেলওয়ে কারিগরী উৎকর্ষতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

রেলওয়ের সেই অংশটুকুতে রেল লাইন সুরঙ্গ পথে বসানো হয়নি, বরং পর্বত গাত্রের পাশ দিয়ে গ্যালারির মত করে লাইন বসানো হয়েছিলো। রীফ্‌ট শুরু হওয়ার আগের ষ্টেশনে লোকোমটিভ ইঞ্জিনের সামনে একটি কাঠের বেঞ্চ খুব ভালভাবে বেধে দেয়া হলো যাতে আমি, স্যার গুথরি ও স্যার জেমস ওটাতে বসে বিনা বাধায় রীফ্‌ট দর্শন করতে পারি। আমাদের সেলুনগুলি ছিল ট্রেনের পেছনে। সার গুথরি ও স্যার জেমস-এরটি ছিল সবশেষে। সেই সেলুনটির শেষ দিকে একটি খোলা জায়গা ছিল যেখানে একটি চেয়ারে বসে মা আরাম করে সব কিছু দেখতে পারেন। মাকে আমি এই ব্যবস্থার কথা বললাম, মা জিজ্ঞাস করলেন; 'তুমি কোথায় বসবে'? আমি তাকে জানালাম যে লোকোমোটিভের সামনে একটি বেঞ্চে আমি বসবো। মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐ বেঞ্চে আমার বসার একটু জায়গা হবে কি'? আমি বললাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই'। তবে সেখানে আপনি আরাম বোধ করবেন না। মা জানালেন ; 'সেই আরামের আমার দরকার নেই। আমি তোমার সাথেই থাকবো।' আমি বুঝতে পারলাম না সম্ভাব্য রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠছেন এবং সেই সাথে কোন বিপদ হলে আমার সাথে যেন থাকতে পারেন, যদিও তেমন কোন বিপদের সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না।

১৯৩৬ সালের মাঝা-মাঝি স্যার ফজলে হোসেন পরলোক গমন করেন। তার বড় ছেলে নাসিম হোসেন আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সে আহমদীয়া জামাআতে যোগ দিয়েছিলো। মা তাকে খুব স্নেহ করতেন। তার বাবার মৃত্যুর কিছু দিন পর সে সিমলায় কি যেন ব্যক্তিগত কাজে এসেছিল, যেহেতু সেদিনই তার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল কাজেই অল্প কিছুক্ষণ তার সাথে দেখা হয়েছিল। নাসিম চলে যাওয়ার পর মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সংসারের দায়িত্বভার নাসিম কেমন বহন করছে'? আমি জানালাম, যেহেতু আমি খুব কম সময় পেয়েছিলাম তাই বেশী কিছু জানতে পারি নাই। যা বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় ভালভাবেই পারছে। তবে একটি ব্যাপারে আমি খুব আনন্দিত সে বলেছে যে, 'আমি তোমার কাছে যেমন সেও তার মায়ের কাছে তেমন হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'। মা বললেন, যে, 'সেটা খুব ভাল কথা। মা ও ছেলের মধ্যে ওরকম সম্পর্কই হওয়া উচিত।

কিছু দিন পর নাসিম হোসেন আবার এক ব্যস্ত সফরে আসে। তাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিলো, সে বললো, 'যেমন আমরা আশা করেছিলাম তেমন করে আমাদের মা ছেলের বনিবনা হচ্ছে না। আমিও আমার স্ত্রী সব সময় তার মন বুঝে তার

আরাম ও শান্তির ব্যবস্থা করতে ব্যাগ্র থাকি। কিন্তু কিছুতেই তিনি আমাদের বা আমাদের ছেলে-মেয়েদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে পারেন না। তুমি তো জান যে লাহোরের কত সুন্দর জায়গায় আমাদের একটি বিরাট প্রশস্ত খোলামেলা সব আসবাবপত্রে ভরপুর একটি বাড়ী আছে। তার নীচতলায় সবকিছুর ব্যবস্থা আছে। দোতলায় আছে দু'টো ঘর ও একটি বাথরুম। প্রচন্ড গরমের সময়ও নীচের তলায় ঘরগুলো বেশ ঠান্ডা থাকে। আমরা মার জন্য সম্পূর্ণ একতলা খালি করে দিয়ে দোতলায় এসেছি। সেখানে অন্যান্য অসুবিধা ছাড়াও দিনের বেশীর ভাগ সময় অসহ্য গরম থাকে। যদিও এতে বাচ্চাদের খুব অসুবিধা হয় তবুও এ ব্যাপারে আমাদের কোন অভিযোগ ছিল না। তবুও মা আমাদের দেখতে পারেন না। আমাদের যে তিনি হিংসা করেন। আমি অবশ্যই খুব খেয়াল রাখি যাতে কোন কিছুতে সীমা ছাড়িয়ে না যাই।

আমি নাসিমকে যতদুর সম্ভব সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম, আর তাকে ধৈর্য্য ধরতে বললাম। যখন আমি এই কথা মাকে বললাম। মা বললেন, 'আমি মোটেই আশ্চর্য হচ্ছি না। ফজলে হোসেন সাহেবের স্ত্রী একজন স্বার্থপর মহিলা, অন্যদের জন্য তার বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই। যদিও তুমি আগেই নাসিমের সদিচ্ছা সম্বন্ধে আমাকে বলেছিলে, তবু আমার আশঙ্কা ছিল। তারপর ছোট একটু হাসি দিয়ে তিনি বললেন, বাছা, 'তোমার আমার মধ্যে যে সম্পর্ক তার জন্য শুধু সন্তানকে তোমার মত হলেই চলবে না, মাকেও তো আমার মতো হতে হবে।'

১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মকালের কথা। কাসুর এলাকায় আমার ভাই আসাদুল্লাহ্ খান তখন মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাহী অফিসার। সেই সময় মড়ক আকারে সেখানে কলেরা দেখা দিল। মা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন ও কাসুরের অধিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করতে লাগলেন। বাওয়া ঝাঙা সিং নামে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুপ্রতীম ব্যক্তি, যিনি দেওয়ানী আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ছিলেন। একদিন সিমলায় বেড়াতে এলেন ও এক বিকাল আমাদের সঙ্গে কাটালেন। একদিন তিনি জানালেন যে মা স্বপ্নে দেখেছেন যে, কাসুরের ঐ মড়ক এক সপ্তাহ পর সম্পূর্ণরূপেই নির্মূল হয়ে যাবে। তখন থেকে তিনি প্রতিদিন সংবাদপত্রের মাধ্যমে কাসুরের মড়কের খবরাখবর নিতে লাগলেন। অষ্টম দিনে খবর বেরুলো যে কাসুরে কলেরায় আক্রান্ত আর একজন রোগীও নেই। বাওয়া সাহেব তারমতে এই অবাক করা দৈব ব্যাপারে দারুন ভাবে চমকিত হয়ে গেলেন। কিন্তু সত্যি বলতে এটা কোন অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল না।

অনেক দিন ধরেই মা এই মড়ক সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার সতর্কতামূলক খবরাদি পাচ্ছিলেন যেমন, প্লেগের প্রাদুর্ভাব ও তার নির্মূলের ব্যাপারে মা খবর পেয়েছিলেন।

১৯৩৬ সালে কাদিয়ানে আমার বাড়ী তৈরী শেষ হয়। তিনটি অভ্যর্থনা কক্ষ ও দু'টো ছোট অভ্যর্থনা কক্ষ ও আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি ছাড়াও ওতে ছিল আটটি বড় বড় শোয়ার ঘর। মা'কে বললাম, তার পছন্দমত একটি ঘর বেছে নিতে। যেটিতে যাওয়া সবচেয়ে সহজ ছিল সেটাই মা বেছে নিলেন। তিনি বললেন প্রত্যেক ধরণের ও অবস্থার মানুষ যেন যখন ইচ্ছা হয় তখনই সহজে তার কাছে পৌছতে পারে, সে জন্য তিনি ঐটি বেছে নিয়েছেন। তারা যেন এটা অনুভব না করে যে তারা আমার কাছে পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

কাদিয়ান থাকলে মা কখনো গাড়ী ব্যবহার করতেন না, তা সে শহরে যাওয়ার জন্যই হউক, বাজামাত নামাজে শরিক হওয়ার জন্যই হউক বা উম্মুল মু'মিনিন বা খলীফাতুল মসীহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই হউক। মা সব সময় হেঁটে যেতেন। আমি যখন তাকে গাড়ী ব্যবহার করতে অনুরোধ করলাম, তিনি বললেন ; 'বাছা এটা পূণ্যাত্মা ব্যক্তিদের শহর। শহরের রাস্তায় প্রচুর ধুলো। গাড়ী চালাতে গিয়ে যে ধূলো উড়বে তা যদি ঐ পূণ্যাত্মা ব্যক্তিদের হজম করতে হয় তাতে অশুচির কাজ হবে।

১৯৩৬ সালের শেষ দিকে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম এ্যাডওয়ার্ডের বিয়ের কথাবার্তা উঠলো। সংবাদপত্রগুলি বেশ ফলাও করে উত্তেজনা ছড়াতে লাগলো। আমি মাকে বললাম, এই দুঃসময়ের রাজা যাতে সঠিক পথে পরিচালিত হন তার জন্য তিনি যেন দোয়া করেন। মা আমাকে জানালেন, গত কিছুদিন ধরেই তিনি এ ব্যাপারে পর পর অনেকগুলো বিভ্রান্তিকর ও ভীতিকর স্বপ্ন দেখছেন। মনে হচ্ছে এই স্বপ্নগুলোর সাথে রাজার সিংহাসন আরোহন কালীন তালগোল অবস্থার কথাই প্রকাশ হচ্ছে। যাই হউক আমি তার জন্য দোয়া করবো। তারপর আমি মার কাছে দু'তিন বার এ ব্যাপারে খোঁজ নেই। কিন্তু প্রত্যেক বারই জানালেন সে বিভ্রান্তিকর অবস্থা বেড়েই চলেছে এবং মনে হচ্ছে এর সন্তোষজনক সমাধান হবে না। শীঘ্রই সরকারী খবর এলো যে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাকে যখন এই খবর বললাম, তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, এই লোকটি দায়িত্বজ্ঞানহীন। একজন মহিলার জন্য পৃথিবীর সর্বোচ্চ পদটি ছেড়ে দিতে পারলো।

খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) দৈহিক শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তখন নিয়ম করা হলো যে কাদিয়ানের এক এক মহল্লার অধিবাসীগণ মাসে স্বেচ্ছায় অন্তত এমন কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করবে যাতে দৈহিক শ্রমের প্রয়োজন আছে। তেমনি একটি 'ওয়াকারে আমল'

(দৈহিক শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিবস) দিবসে আমাদের মহল্লার কর্মসূচী ঘোষণা করা হলো। সেটা ছিল ১৯৩৭ সালে। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি জান কাল ওয়াকারে আমল দিবস?'

হ্যাঁ আমি জানি।

তুমি তাতে অংশগ্রহণ করছো তো?

অবশ্যই, কেন আপনি সন্দেহ করেছেন কি?

আমি দ্বিধাগ্রস্থ ছিলাম যে তোমার মন্ত্রীত্ব আবার বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিনা।

"আমি আশা করি , কোন কিছুই আমার কর্তব্য পালনের পথে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।"

"আমি তোমার মুখ থেকে সেটাই শুনতে চেয়েছিলাম।"

১৯৩৭ সালে বেশ ক'টি মাস আমাকে সরকারী কাজে দেশের বাইরে কাটাতে হয়। ফিরে আসার পর মা আমাকে জানালেন যে একটি অভাবিত সুযোগ আপনা আপনি এসে যাওয়াতে তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দশ মিনিটের একটি বিমান ভ্রমনের সুযোগ হাত ছাড়া করেন নি, সেটা নাকি তার কাছে খুব উপভোগ্য হয়েছিলো। সে সময় তার বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বৎসর (৭৪)।

১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষ অর্ধেক আমরা কাদিয়ানে কাটাই। মাসের শেষ দিকে এক সন্ধ্যায় আমি মাকে বেশ আত্মমগ্ন দেখতে পেলাম। আমি খোঁজ করলাম, কি জন্য তিনি এমন হয়ে আছেন। মা ব্যাখ্যা দিলেন ঃ "আমি সূর্যাস্তের একটু আগে শহর থেকে ফিরে আসছিলাম। তখনো আমাদের বাড়ী থেকে কিছু দূরে আছি, এমন সময় দেখি একজন মহিলা রাস্তার পাশের এক বাড়ীর দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার সঙ্গে দুটো মেয়ে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি বুঝতে পারলাম যে, মহিলাটি যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, আর মেয়ে দুটো তাকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি পেছনে ফিরে এসে মহিলাটির কাছে বসলাম। দেখলাম মহিলাটি খালি পায়ে আছে ও তার একটি পায়ের যত্ন নিচ্ছে। তার যন্ত্রণার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখলাম যে তার পায়ে একটি বেশ বড় ধরণের লোহার শলা ঢুকে আছে, শুধু আগাটুকু দেখা যাচ্ছে। মহিলার বেশ কষ্ট হচ্ছিলো। আমিও একা ছিলাম, আশেপাশে কাউকে দেখাও যাচ্ছিলো না। কাজেই নিজেই লোহার শলাটা টেনে বের করবো বলে ঠিক করলাম। কিন্তু যেই হাত বাড়িয়েছি মহিলাটি ভয়ে আৎকে উঠলো। বললো যে এই ব্যথা সে সইতে পারবে না। তাই আমি যেন ওটা বের করার চেষ্টা না করি। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাকে সামর্থ

ও শক্তি দিলেন, আমি এক হাতে শক্ত করে পায়ের গোড়ালী চেপে ধরে অন্য হাতে শলাটির আগায় ধরে জোরে টান দিয়ে তা বের করে ফেলতে সামর্থ হলাম। শলাটি দু'তিন ইঞ্চি লম্বা ছিলো এবং জং পড়াও ছিলো। এটা তুলে আনার পরই ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়লো। যন্ত্রণায় মহিলাটি চিৎকার দিয়ে উঠলো। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সে আরাম বোধ করতে লাগলো। আমি তাকে বললাম, আমাদের ঘর কাছেই, আমি তাকে ধরে ধরে নিয়ে আসবো। তারপর পা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিব যাতে পেকে না যায় তার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু মহিলাটি শুনলো না। বলল তার বাড়ীও নাকি কাছের এক গ্রামে। মেয়ে দু'টোর উপর ভর করে পৌঁছে যেতে পারবে। এখন তার ব্যাপারে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে, যদি তারকাটায় ইনফেকশন হয়। আমি তার জন্য দোয়া করছি।

এটা এমন সময়ের কথা যখন তিনি অনুভব করতে পারছিলেন যে, তার উপরও একটি ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

অনুচ্ছেদ–১৩
বিদায়

প্রায় এক বৎসর ধরে মাকে তার প্রস্থানের ব্যাপারে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছিলো। মা ভাল ভাবেই জানতেন আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকেই এগুলো আসছে। তবে এগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানতেন। তার মৃত্যুর অনেক বৎসর আগে থেকেই মাকে জানানো হয়েছিলো যে তিনি এপ্রিল মাসে ইন্তেকাল করবেন। কয়েক বৎসর পর আবার জানতে পারলেন যে এপ্রিল মাসের শেষ বুধবারেই তিনি পরপারে যাবেন। তিনি ওসীয়্যত করলেন, তাকে যেন কাদিয়ানের বেহেশ্‌তি মাকবেরা কবরস্থানে দাফন করা হয়। এই কারণে গত কয়েক বৎসর থেকে আমি এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যেন এপ্রিলের শেষ অর্ধেক আমরা কাদিয়ানে থাকতে পারি। এটা মায়ের ইচ্ছানুসারেই করা হয়েছিলো মা'ও এতে বেশ স্বস্তি বোধ করতেন।

বাবার মৃত্যুর কিছু দিন পর মা একবার তাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। তার সঙ্গে চৌধুরী সানাউল্লাহ্ খান যিনি বিবাহ সূত্রে তার আত্মীয় হতেন তিনিও ছিলেন। মার বিষন্ন মুখ দেখে বাবা উদ্বেগ প্রকাশ করায় সানাউল্লাহ্ খান মন্তব্য করেন, আপনার বিরহের কারণেই তো তিনি বিষন্ন থাকেন। আপনি তাকে কেন নিজের কাছে নিয়ে আসেন না? এতে বাবাও বেশ বেদনাহত হলেন এবং বললেন তার ঘরটি এখনো তৈরী শেষ হয়নি। ওটা শেষ হলে আমি নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আসবো।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে আমাকে বিলাত যেতে হয়। মা জানতে চাইলেন আমি এপ্রিলের আগে ফিরবো কি না। আমি তাকে জানালাম, সে রকম আশা আছে। তাতে মা বেশ আশ্বস্ত হলেন। ইংল্যান্ড থেকে চিঠি লিখে আমি মাকে জানালাম যে এপ্রিলের ১ তারিখে সন্ধ্যায় আমি দিল্লী ফিরে আশার আশা রাখি এবং ১৪ তারিখে কাদিয়ানে পৌঁছবো বলে আশা করি। তিনি ইচ্ছা করলে দিল্লী আসতে পারেন। ১লা এপ্রিল প্রায় দেড় ঘন্টা দেরীতে ট্রেন দিল্লী পৌঁছায়। আমাকে জানানো হলো যে স্টেশনের বাইরে গাড়ীতে মা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি তাড়াতাড়ি মার কাছে ছুটে গেলাম। আমাকে উক্ত অভ্যর্থনা জানিয়ে মা বললেন, তুমি কিভাবে ভাবতে পারলে যে এতো দিন আমি তোমার জন্য কাদিয়ানে বসে অপেক্ষা করতে পারি? আমরা দিল্লী থাকা কালে মা উচ্চ রক্ত চাপে আক্রান্ত হন। এটা আগেও তার কখনো কখনো দেখা দিয়েছিলো। উপযুক্ত চিকিৎসার পর রক্তচাপ প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসে। দিল্লী থেকে কাদিয়ান

রওনা হওয়ার আগে মা এক স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে দেখেন। দেখেন যে তিনি একটি চৌকিতে শুয়ে আছেন এবং তাঁকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছে মাও এতে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। মা নিবেদন করলেন, হুযূর আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি আপনার পায়ের পাতা টিপে দেই। তিনি সদয় সম্মতি দিয়ে চৌকির কিনারে বসার জায়গা করে দিলেন। মা সেখানে বসে তার পায়ের পাতা টিপে দিতে লাগলেন। হঠাৎ মা চিন্তা করলেন যে, এখন যখন হুযূরের মনটা বেশ উৎফুল্ল আছে তখন তাঁর কাছে দোয়ার জন্য আবেদন করলে কেমন হয়। মা যখন মনে মনে একথা বলবেন বলে ঠিক করছেন তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর ডান দিকে কাউকে মা-এর দিকে ইশারা করে বললেন, এর ঘরটি বড় করে তৈরী করো।

এই স্বপ্নটি মাকে ভীষণ আনন্দ দিয়েছিলো। তিনি এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং বেশ সুখী হয়েছিলেন। কাদিয়ানে তিনি খলীফাতুল মসীহর (জামাআতের তিনি দ্বিতীয় খলীফা) কাছে স্বপ্নটি বর্ণনা করে একটু হেসে বললেন, হুযূর আমি ভাবছিলাম যে তার (বাবার) কবরের এক পাশে তার খলীফা ও অন্য পাশে আব্দুস সাত্তার আফগানকে কবর দেওয়ার ফলে আমার জন্য জায়গা সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়ায় আমি অভিযোগ জানাবো। খলীফাতুল মসীহ বললেন যে, স্বপ্নে তার যে গৃহের কথা বলা হয়েছে তা বেহেশ্‌তি তার আবাস্থলকেই ইশারা করে। তারপর মা যখন আমার কাছে পুরো ব্যাপারটি বললেন, তখন জানালেন 'আমি ভাল করেই জানতাম স্বপ্নে আমাকে বেহেস্তের ঘরের কথাই বলা হয়েছে। তবু আমার কবরের কথাটা তুলে হযরত সাহেবের সাথে একটু মজা করলাম।'

তখন তার বয়স এসে দাঁড়িয়েছিল পঁচাত্তরে। মাঝে মাঝেই তিনি উচ্চ রক্তচাপে ভুগতেন। তবু তিনি মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই চলছিলেন। শুক্রবারের জুমুআর নামাযের জামাতে যেতেন, খলীফাতুল মসীহকে শ্রদ্ধা জানাতে যেতেন ও উম্মুল মু'মিনিনকে রোজ একবার দেখতে যেতেন। বেশ গরমের সময় ছিল তখন। তবু মা সবখানেই পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা করতেন। তিনি সেদিন শুনলেন যে খলীফাতুল মসীহ্ ২৫ তারিখে (সোমবার) সিন্ধু প্রদেশে যাবেন, তাতে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। পরে আবার যখন জানা গেল যে তিনি ২৭ তারিখের (বুধবার) আগে রওনা হচ্ছেন না তখন আস্বস্ত হলেন। খুব উৎফুল্ল কণ্ঠে আমাকে এসে বলতে লাগলেন ঃ 'শুনেছ হযরত সাহেব ২৭ তারিখে যাচ্ছেন'। আমি বললাম, ও তাই বুঝি? তিনি আবার একটু জোর দিয়ে বললেন, '২৭ তারিখে'। আমি বললাম তাতো বুঝতে পারলাম। আসলে যা তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন তা হলো ২৭ তারিখেই এপ্রিল মাসের শেষ বুধবার পড়ে তার মানে মা'র স্বপ্ন যদি এ

বৎসরই শাব্দিক অর্থে পূর্ণ হয় তবে ২৭ তারিখে খলীফাতুল মসীহ্ মার জানাযা পড়িয়েই রওনা হতে পারবেন।

২৭ তারিখ ভোরে মা বেহেশ্‌তি মাকবেরায় গেলেন। আমাকে বলেছিলেন যে তার ভেতরের তাপমাত্রা যেন কিছুটা বেশী মনে হচ্ছে। তবে তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলেন নাই। সেই সময়ই তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে প্রায়ই অর্ধ সচেতন অবস্থায় তিনি শুনতে পেতেন যে একজন যেন অন্য একজনকে বলছে, কিছু একটা আসন্ন, তাতে অন্য জন বলছে, এবার তা অবশ্যই ঘটবে। ২৮ তারিখে মা জানালেন যে, তিনি স্বপ্নে বেহেশ্‌তি মাকবেরায় পাশাপাশি সাতটি মৃতদেহকে কবর দেওয়ার অপেক্ষায় শোয়ানো দেখতে পেয়েছেন।

৩০ তারিখে সন্ধ্যায় সিমলার উদ্দেশ্যে আমাদের কাদিয়ান ত্যাগ করার কথা ছিলো। সেদিন বিকালেই মা জানালেন যে তিনি মোটেই ভাল বোধ করছেন না। আমি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের জন্য খবর পাঠালাম। কিন্তু সে খবর ডাক্তারের কাছে পৌঁছে নাই। আমি মাকে বললাম যে পরদিন সিমলায় পৌঁছেই তাকে একজন উপযুক্ত ডাক্তার দিয়ে দেখানো হবে। সেই সন্ধ্যায়ই আমরা কাদিয়ান থেকে রওনা হই। বাটালা থেকে আমার ব্যক্তিগত সচিব (প্রাইভেট সেক্রেটারী) আমাদের সাথে যোগ দেয়। মা তার স্ত্রী কোথায় আছে জানতে চাইলো। তাকে জানানো হলো যে সে বেচারী অসুস্থ থাকায় নিজের বার্থে শুয়ে আছে। মা তাকে নিজের সেলুনে আসার জন্য বললেন এবং তার জন্য নিজের বেডরুম ছেড়ে দিয়ে নিজে সোফার উপর সারারাত কাটায়ে দিলেন। পরদিন মা আমাকে বললো যে গতরাতে তিনি স্বপ্নে বাবাকে দেখেছেন বাবা যেন তাকে বলেছেন, তুমিতো বেশ অসুস্থ। আমি তোমার জন্য এমন একজন ডাক্তার নিয়ে আসছি যার ফি বত্রিশ (৩২) টাকা।

সিমলা পৌঁছার পর ডাক্তার মাকে পরীক্ষা করে জানালো উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনীর ইনফেকসন আছে। তার চিকিৎসা চললো কিন্তু মা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। সিমলা আসার পর পরই মা আরো একটি স্বপ্ন দেখেন, দেখেন বাবা এসে মাকে বলছেন আমি তোমার জন্য একটি পালঙ্ক এনেছি। তুমি যখনই প্রস্তুত হবে তখনই যেতে পারো। মা বললেন, ভোর হওয়ার আগেই আমি প্রস্তুত হয়ে যেতে পারি। তাহলে ভোরের শীতল আবহাওয়ায় আমরা আমাদের সফর শুরু করতে পারি। বাবা বললেন, ছেলেমেয়েদের নাস্তার পর সকাল ৮টার পর রওনা দেওয়াই ভাল হবে। এই স্বপ্ন বর্ণনা করার সময় মা সেই পালঙ্কটির বর্ণনা

দিচ্ছিলেন, তার আনুসঙ্গিক খুটিনাটি। রঙ্গিন সিল্কের মশারী ও রূপালী জড়োয়া গহনা পত্র দিয়ে সাজানো ছিল সেটি।

পাঁচ দিন পার হয়ে গেলো। মা বেশ দূর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তবু তিনি ছিলেন বেশ সৌম্য এবং উদ্বিগ্নতার কোন লক্ষণই ছিলো না, তিনি নিজে নিজে ওঠে ওজু করতেন। নিজেই নামাজের বিছানা পেতে নামায পড়তেন। কারো সাহায্য নিতেন না। যদিও বেশীর ভাগ সময় তাকে বিছানায় থাকতে হতো। চতুর্থ দিন ডাক্তার বলে গেলো যে মাকে বিছানা ছেড়ে উঠা চলবে না, সব সময় বিছানায় থাকতে হবে। সেদিন ছিল ৬ই মে শুক্রবার। বেলা ৪টায় আমি মা'র কাছে গেলাম। ঘরের বাইরের বারান্দায় নামাযের বিছানায় তিনি নামায পড়ছিলেন। তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর স্মরণ করিয়ে দিলাম যে তার ডাক্তার তাকে বিছানা থেকে নামতেই নিষেধ করেছেন। তিনি জানালেন যে স্বাভাবিক ভাবে নামায পড়তে তার কোন অসুবিধাই বোধ হচ্ছে না। আমি তাকে ধরে ধরে বিছানায় নিয়ে যেতে চাইলে তিনি আলতো করে আমার হাতে হাত রেখে নিজে নিজেই হেঁটে বিছানায় পৌঁছলেন। কোন সাহায্যের প্রয়োজন তিনি বোধ করলেন না।

সেইদিন সন্ধ্যায় আমি আমার অফিস রুমে কাজ করছিলাম। খবর এলো মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তার ঘরে পৌঁছে দেখলাম অত্যাধিক দূর্বলতার কারণে মা অর্ধ সচেতন অবস্থায় আছেন। তার পায়ের পাতা মালিশ করে দেওয়া হচ্ছিলো। ফলে তিনি কিছুটা সচেতন অবস্থায় কথা বলতে শুরু করেন। মা জানালেন, তুমি চলে যাওয়ার কিছু পরেই আমি আধো ঘুমে পড়ে গেলাম এবং অনুভব করলাম যেন আমি ঘন অন্ধকারে পড়ে আছি এবং তা থেকে বেরিয়ে আশার চেষ্টা করছি। একটা তাবু দেখে মনে করলাম এর ভিতর দিয়ে বোধ হয় বের হওয়ার কোন রাস্তা পাওয়া যাবে। তাই এর ভেতরে ঢুকলাম। কিন্তু এর ভেতরে ছিলো আরো গভীর অন্ধকার আর ছিল কাদা। আমার পা সেই কাদায় এমন ভাবে আটকে গেলো যে শত প্রচেষ্টায় তা উঠিয়ে আনা হচ্ছিলো না। নিরুপায় হয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, জাফরুল্লাহ্ খানকে যদি এই খবরটি জানানো যায় তাহলে সে নিশ্চয়ই আমাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করবে।'

পরদিন তাকে একটু ভাল মনে হলো, যদিও বেশ দূর্বলতা ছিলো। একবার তার মনে হলো যে যদি ডাঃ আব্দুল লতিফ কাছে থাকতো তবে হয়তো তার উপযুক্ত মতো চিকিৎসা হতো। আমি সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে তার কাছে টেলিগ্রামে জানালাম যে মা তাকে দেখতে চেয়েছেন। পরদিন সকালেই ডাঃ লতিফ এসে উপস্থিত

হলো। তাকে মায়ের ঘরে ঢুকতে দেখেই মা বেশ খুশী হয়ে উঠলেন এবং বিছানার উপর উঠে বসলেন। তাকে উষ্ণ সোহাগ সম্বর্ধনা জানিয়ে মা বললেন, এইবার যদি আমাকে ভালো করে তুলতে পারো তবে আমি স্বীকার করবো যে তুমি আসলেই একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক হয়ে উঠেছো। সে বললো, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই দয়া করবেন। আপনি তো দেখতে পেলেন যে আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই আমি চলে এসেছি। মা বললেন, আমি তো কোন টেলিগ্রাম পাঠাইনি, তারপর উৎসুকভাবে আমার দিকে ফিরলেন। আমি বললাম, আপনি ইচ্ছা করেছিলেন যে, 'সে যদি এখানে থাকতো' আমি বললাম, তাই আমিই টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলাম।

ডাঃ লতিফ মাকে খুব ভালভাবে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে জানালো যে মাকে যত শীঘ্রই সম্ভব সিমলা ছাড়তে হবে। সিমলা সমুদ্র সমতল থেকে বেশ উঁচুতে বলে মায়ের হার্টের উপর চাপ বেশী পড়ছে। সে প্রস্তাব করলো মাকে দিল্লীতে তার নিজের বাসায় নিয়ে রাখার। এতে করে মায়ের নিয়মিত চেকআপের সুবিধা হবে আর তার স্ত্রীও মায়ের সেবা যত্ন করতে পারবে। সে আশ্বাস দিলো যে আল্লাহ্ চাহে তো কয়েক দিনের মধ্যেই মা আগের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। কাজেই শীঘ্রই তাদের দিল্লী যাওয়ার ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করা হলো। আমার দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য সিমলা থেকে যেতে হলো। তবু সেদিন রোববার ছিলো বলে রেল যোগাযোগের কেন্দ্র কল্কা পর্যন্ত গিয়ে তাদের দিল্লীগামী ট্রেনে তুলে দেওয়াই ঠিক করলাম। পরের সাপ্তাহিক বন্ধে আমি দিল্লী যেতে পারবো।

আমার স্ত্রী জেদ ধরলো মায়ের দেখাশুনা ও সেবা যত্নের জন্য সেও মায়ের সঙ্গে দিল্লী যাবে। মাতো এটা শুনবেই না। দিল্লী খুবই গরম জায়গা, আমাদের বাচ্চা মেয়ে আমাতুল হাইকে সেরকম গরম জায়গায় নেওয়া তার মতে মোটেই উচিৎ হবে না। ডাঃ লতিফের স্ত্রী মায়ের কাছে মেয়ের মতই, কাজেই তার কাছে মায়ের কোন অযত্ন হবে না বলে মা নিশ্চিত। কিন্তু আমাতুল হাই'র মা অনঢ়। মা (তার শ্বাশুড়ী) অসুস্থ থাকবে আর সে তার সেবা যত্নের জন্য হাতের কাছে থাকবে না, এ কথা সে কল্পনাই করতে পারে না।

উচ্চতার জন্য যে চাপ তা যেন হঠাৎ করে পড়ে না যায় সে জন্য সিমলা থেকে কল্কা পর্যন্ত যাত্রা খুব ধীরে ধীরে যাত্রা বিরতি নিয়ে করা হয়েছিলো। মা এই যাত্রা ভালভাবেই পার হলেন। ট্রেনের যাত্রার সময় ছিলো মধ্যরাতে কিন্তু রাতের খাওয়ার পরেই সবাই নিজেদের কামরায় আরাম ও স্বস্তির সাথে বসে পড়তে পেরেছিলো। আমার কল্কার রেলওয়ের রেষ্ট হাউজে রাত্রি যাপন করে পরদিন সকালে সিমলা ফিরার কথা। রাত দশটার দিকে মা আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে বললেন। আমাকে

জড়িয়ে ধরার জন্য মা উঠে দাড়ালেন। ডাঃ লতিফ চেঁচিয়ে উঠলো মা শুয়ে থাকুন, শুয়ে থাকুন। মা বললো, হ্যাঁ বৎস, শুয়ে থাকার জন্য আমি প্রচুর সময় পাবো কিন্তু আমি জানি না এর সাথে আমার আবার দেখা হবে কি না।

আমার সাথে সিমলা থেকে দু'জন চাকর এসেছিলো তাদের বললাম যেন ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত ওরা ষ্টেশনে মায়ের কাছে থাকে। তারপর ষ্টেশন সংলগ্ন আমার রেষ্ট হাউজে গেলাম। পরদিন সকালে আমি সিমলা ফিরে যাওয়ার জন্য যখন প্রস্তুত হলাম, দেখলাম আমার দরজার বাইরে কাঠের মেঝের উপর চাকর দু'জন সটান শুয়ে আছে। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম কেন তারা নিজেদের বিছানায় শুতে যায় নি। তারা জানালো যে আমার আসার কিছুক্ষণ পরেই মা তাদের ষ্টেশনে দেখতে পেয়ে তাড়া লাগালেন যেন রেষ্ট হাউজে এসে অবশ্যই আমার দরজার দু'পাশে শুয়ে থাকে।

সোমবার আমি দিল্লীতে টেলিফোন করে মায়ের খবর নিলাম। জানানো হলো মা কিছুটা ভালর দিকে ও হাঁসিখুশী আছেন। দিনের মাঝামাঝি তার কিছুটা বমি বমি ভাব হয়েছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তা আর ছিল না। মঙ্গলবার সকাল ও সন্ধ্যায় দু'বার টেলিফোন করে খবর পেলাম তিনি আগের মতই আছেন। মে'র ১১ তারিখ বুধবার সকালেও একই রকম। কিন্তু বিকালে চৌধুরী বশীর আহমদ টেলিফোন করলো ঃ দুপুরের পর চাচীর শরীর কিছুটা খারাপ হয়ে পড়ে। তাকে কিছু ইনজেকশন দেওয়ার পর এখন আগের অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি সজ্ঞানেই আছেন? মোটামুটি আরাম বোধ করছেন এবং কথাবার্তাও বলছেন। কিন্তু তার সামগ্রিক অবস্থা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না এবং আমার মনে হয় আপনার খুব তাড়াতাড়ি একবার আসা প্রয়োজন।

আমি তো আজ যেতে পারবো না। আগামীকাল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মিটিং আছে তা স্থগিত করা সম্ভব নয়। আগামীকাল বিকালে আমি রওনা হবো এবং শুক্রবার সকালে দিল্লী পৌঁছবো। তাতে করে সপ্তাহের শেষ দু'টি দিন আমার দিল্লীতে থাকা সম্ভব হবে।

আমার মনে হচ্ছে আপনাকে আমি বুঝাতে পারছি না।

আমি বুঝতে পারছি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমার দায়িত্ব আমার পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা পরম দয়ালু এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে তিনি দয়ার প্রকাশ দেখাবেন।

যা আপনার ইচ্ছা।

সন্ধ্যায় আবার আমি ফোন করলাম। জানলাম মা অনেকটা ভাল বোধ করছেন এবং এই মুহূর্তে ভয় পাওয়ার মত তেমন গুরুতর কিছু নেই। ডাক্তার লতিফ মার

সুচিকিৎসার জন্য সিভিল সার্জনকেও নিজের সাথে সংযুক্ত করে নিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সকালেও একই সংবাদ পাওয়া গেল। যাই হোক আমি আমার সব ভাইবোনদের টেলিগ্রাম করে দিলাম যে আমি দিল্লী যাচ্ছি, তারা যেন সবাই আসে। শুক্রবার সকালেই আমি দিল্লী পৌছাঁই। সেদিন ছিল মে মাসের ১৩ তারিখ। মাকে বেশ তাজা ও হাসিখুশী দেখে মনটা ভরে উঠলো। আমার স্ত্রী জানালো যে মা সকালেই তাকে গোসল করিয়ে চুল বেঁধে পরিপাটি করে দেওয়ার জন্য জেদ ধরেছিলেন, যাতে আমি আসার আগেই তা শেষ হয় এবং আমি তাকে অপরিচ্ছন্ন না দেখি।

ডাঃ লতিফ জানালো যে নিজের স্বাস্থ্য ও আরামের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আমার স্ত্রী সার্বক্ষণিক ভাবেই মার সেবা যত্নের জন্য একান্তভাবেই মগ্ন ছিলো। আমি ভেবে দেখলাম যে মায়ের কোন সন্তান এই রকম নিঃস্বার্থ সেবার সুযোগ পায় নাই। এমনকি আমি নিজেও না এবং মায়ের আর কোন পুত্র বধুও না। মাও জানালেন যে ডাঃ লতীফ ও তার স্ত্রী মায়ের এত সেবা যত্ন করেছে যে, নিজের ছেলে মেয়েও এতো করে না। মা বললেন, আল্লাহ্ যদি আমাকে হায়াত দেন তবে যতদূর সম্ভব আমি এই ঋণ শোধ করার চেষ্টা করবো। তবে এইরূপ ঐকান্তিক সেবার প্রকৃত পুরস্কার তো কেবল আল্লাহ্ তাআলাই দিতে পারেন।

আমার মায়ের অসুস্থতার সময় যারা নূন্যতম সেবা করেছেন আল্লাহ্ তাআলা তাদের অশেষ পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন।

সালাম ও কুশল বিনিময় এবং আমার আগমনের রেশ কাটার পর যখন আমি মায়ের সাথে একা হলাম, মা বলেন, এখন দেখ। .....

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, এখন আল্লাহ্ তাঁর নিজ অনুগ্রহে আপনাকে ভাল করে দেবেন। ডাঃ লতীফ আমাকে বলেছে দুই দিন আগের তুলনায় আপনি এখন বেশ ভালই আছেন।

মা বললেন, আমি বলছিলাম এখন তুমি আমাকে কাদিয়ানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো। আমি জানালাম যে মার যে ধরণের ডাক্তারী সুযোগ সুবিধা দরকার তা এখন কাদিয়ানে পাওয়া সম্ভব হবে না। মা আশা ছেড়ে একটু হাসলেন। আর জোর করলেন না।

সেই দিনটি তিনি তুলনামূলক ভাবে ভালই কাটালেন। তার বমি বমি ভাবটি ছিল না। সেটি ছিল একটি নিশ্চিত উন্নতি, যাতে তার পূর্ণ আরোগ্যের আশা আরো বেড়ে উঠেছিলো। ফলে আমাদের মধ্যে ঠিক হলো যে আমার ছোট বোন ও তার স্বামী পরদিন সন্ধ্যায় তাদের বাড়ী ফিরে যাবে, আমি সিমলা ফিরে যাবো।

১৪ই মে মার অবস্থার কোন পরিবর্তন ছিলো না। চৌধুরী বশীর আহমদ প্রত্যেককে দুপুরে খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলো। আমি আমার স্ত্রী মায়ের কাছে থেকে গেলাম। বেলা দু'টোর সময় আমি যখন নামাযের জন্য ওজু করছিলাম কেই একজন এসে দরজায় এসে ধাক্কা দিয়ে জানালো যে মা আমাকে ডাকছেন। আমি তার ঘরে গিয়ে দেখলাম, মা এক হাতে তার নাড়ি (পাল্‌স) দেখছেন। আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, আসো বাছা আমাদের শেষ কথা বলে যাই। অন্যদেরও ডেকে পাঠাও। এতোক্ষণে বোধ হয় তাদের খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে।

ঘরে ডাঃ লতীফ একটি ইনজেকশন তৈরী করছিলো। আমি তার দিক জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালাম। সে ইংরেজীতে বললো, তিনি আমার চেয়ে চালাক। তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে তার পাল্‌স পাওয়া যাচ্ছে না। তার হৃদযন্ত্রের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। কিন্তু তাকে আমি একথা বলিনি। আমি একটা ইনজেকশন তৈরী করছি। আশা করছি এতে কিছুটা কাজ হবে। তারপর ডাঃ লতীফ ইনজেকশনটি দিয়ে তার পাল্‌স ধরে দেখলেন। কয়েক মিনিট পর সে মাকে জানালো যে পাল্‌স স্বভাবিক পাওয়া যাচ্ছে। মা নিজে পাল্‌স ধরে দেখলেন, তারপর বল্লেন, এটা মোটেও স্বাভাবিক নয়। পাল্‌স এসেছে ঠিকই, তবে তা খুবই দূর্বল।

ডাঃ লতীফ সিভিল সার্জনকে টেলিফোন করে তাড়াতাড়ি আসতে বললো।

যারা দুপুরের খাওয়ার দাওয়াতে গিয়েছিলো তারাও ফিরে এলো, তার কিছু পরেই এলো শেখ ইজাজ আহমদ ও বশীর আহমদ। মা আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন খুব ধীরে কিন্তু সৌম্যভাবে! তিনি বললেন ; 'আমাদের সবাইকেই এক সময় জীবনের এই মুহূর্তটির সামনে এসে দাঁড়াতে হবে'। বাবা-মার বিচ্ছেদ খুব দুঃখ জনক। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট। তার কাছে আমি সন্তোষ চিত্তেই যাচ্ছি। আমি তোমাদের সবার কাছ থেকে বিদায় চাই।

আমার ইচ্ছা এখন বা মৃত্যুর পর তোমরা কোন হৈ চৈ বা কান্নাকাটি করবে না। তারপর মা তার মেয়ের কানে কানে কি যেন বললেন। মেয়ে ও মায়ের কানে কানে কি যেন বললো। তার পর একে একে সবাইকে দোয়া করতে করতে বিদায় জানালেন, প্রথমে ছেলেদের, তারপর ছেলের বৌদের, তারপর বশীর আহমদ, তার স্ত্রী আহমদাহ্‌ বেগম, ইজাজ আহমদ, ডাঃ লতীফ, তার স্ত্রী আমিনাহ্‌ বেগম তাকে মা নিজের সোনার আশরফির মালা উপহার দিলেন। তারপর মায়ের মৃত এক বোনের বড় ছেলে গোলাম নবী, মায়ের একমাত্র ভাইয়ের মেঝো ছেলে

আজিজ আহমদ, আমার ওকালতী জীবনের সময় আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহচর ও কেরাণী চৌধুরী ফজল দাদ। তারপর আমার মেয়ে আমাতুল হাইকে ডেকে তাকে মা চুমু দিয়ে বিদায় নিলেন। তারপর আমাদের ড্রাইভার সৈয়দ আব্দুর করীমকে ডেকে তার কাছে থেকে বিদায় নিলেন, তাকে ধন্যবাদ জানালেন। গোলাম নবী খুব শোকাবিভূত হয়ে পড়ছিলো। তাকে মা সান্তনা দিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'যদি কখনো সে ভুলত্রুটি করে ফেলে তবে এখনকার এই মুহূর্তটির কথা মনে করো এবং তার সেই ত্রুটিকে ক্ষমা করে দিও'।

তারপর তিনি আমার ছোট ভাই শুকরুল্লাহ্ খানের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার বক্সটা কি এনেছো? সে বেচারী ঘাবড়ে গিয়ে বললো, কোন বক্সটি? মা ব্যাখ্যা করলেন, সেই বক্সটি যেটির মধ্যে আমার কাফনের কাপড় ছিলো'। তার পুত্র বধু ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বললো আমি বুঝতেই পারিনি যে বক্সটি দাস্কায় রয়েছে। তাছাড়া আমরা এত তাড়াহুড়ার মধ্যে দাস্কা ছেড়ে এসেছি যে অন্য কোন কিছুর কথাই চিন্তা করতে পারিনি।

আমার স্ত্রী আমাকে আগে বলেছিলো যে আমার দিল্লী আসবার আগে মা তাকে জানিয়ে ছিলেন যে তার মৃত্যুর পর কাদিয়ানে তার মৃতদেহ নিয়ে যেন দোতলায় তার ঘরে না রাখা হয়, বরং নীচতলায়ই একটি জায়গার কথা নির্দিষ্ট করে সেখানেই তাকে গোসল করাবার জন্য বলেছিলেন। এখন তিনি তার ঐ ইচ্ছার কথা আমাকে জানালেন। আমার স্ত্রী জানালো যে ঐ স্থানটুকু তো খুব ছোট, তাছাড়া বেশ খোলামেলা। মা বললেন, 'কাদিয়ান থেকে আসবার আগে আমি ভাল করে দেখে এসেছি। ঐ জায়গাটাই সবচেয়ে উপযুক্ত। ওটা খুব বেশী ছোটও নয়, আর তেমন খোলামেলাও নয়। সেটা বেশ আড়াল করা আছে এবং এই কাজের জন্য যথেষ্ট।

ইতিমধ্যে সিভিল সার্জন এসে গিয়েছিলো। দু'ডাক্তার মিলে পরামর্শও করছিলো। আমি তাদের বললাম যে যদি উপযুক্ত ও পরবর্তী চিকিৎসার প্রয়োজন তাদের রোগীকে দিল্লী থাকতে হয় তবে নিশ্চয়ই তা করবেন। কিন্তু যদি তাদের মতে ডাক্তারী শাস্ত্রের সব প্রচেষ্টা শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে মায়ের ইচ্ছানুসারে আমি মাকে কাদিয়ান নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি। তারা জানালো যে এখন পর্যন্ততো মায়ের হৃদপিন্ড তাদের চিকিৎসায় সাড়া দেয়নি। এখন তারা আর ক'টি নতুন ইনজেকশন দেবে। তাতে হৃদযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া জানা যাবে প্রায় পৌনে এক ঘন্টা পর। কেবল মাত্র তখনই আমার এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। সেই ইনজেকশনগুলো দেওয়া হলো। আমি সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। বিকাল পাঁচটার সময় ডাক্তাররা আমাকে জানালো যে

হৃদযন্ত্রের কোন শুভ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের মতে আর ৩০ থেকে ৪০ মিনিট পর এর কাজ পুরোপুরি থেমে যাবে।

আমি মা'র নিকটে গেলাম, তাকে বললাম যে কাদিয়ান নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাদি করেছি। মা খুব খুশী হয়ে কায়মনোবাক্যে বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন'। আমি আরো জানালাম, আপনাকে তো এম্বুলেন্সে করে রেলষ্টেশনে নিয়ে যেতে হবে। তারপর ট্রেনের সেলুনে করে নিয়ে যেতে হবে। এতে করে হয়তো আপনার বেশ একটু অসুবিধা ঘটবে। মা উত্তর দিলেন, বাছা, 'তুমি দেখেনিও আল্লাহ্ তাআলা আমাকে কোন অসুবিধায়ই ফেলবেন না'।

মা তখন আমাকে আমার শ্বাশুরী বিসমিল্লাহ্ বেগমকে লাহোরে ফোন করে পরদিন সকালে অমৃতসরে ষ্টেশনে যেন মার সঙ্গে দেখা করেন সে কথা বলতে বললেন। আমার শ্বাশুড়ীকে মা খুবই ভালবাসতেন। তারপর মা আমার ছোট ভাই আব্দুল্লাহ্ খানকে বললেন কাসুরে একজনকে টেলিফোন করতে, যাতে ঐ ব্যক্তি মোটর কারে দাস্কা চলে যায় এবং যে বক্সে মায়ের কাফনের কাপড় আছে সেটি নিয়ে যেন পর দিন সকালে অমৃতসরে মায়ের ট্রেন ধরে। এসব কিছু করার পর তার পরম প্রভূর সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজের আত্মাকে প্রস্তুত করে বসে রইলেন। তাকে ট্রেনের সেলুনে তোলা হয়েছিলো কোনরূপ কষ্ট ও অসুবিধা ছাড়াই। এটা একটি আশ্চর্যের ব্যাপার ছিলো যে, ডাক্তারদের মতামত উপেক্ষা করে আল্লাহ্ তাআলার এই নগণ্য দাসীর হৃদযন্ত্র তারই কৃপায় সচল থাকলো যদিও তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছিলো।

পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও কাজের লোকজন ছাড়াও ডাক্তার লতীফ, শাহ ইজাজ আহমদ ও চৌধুরী বশীর আহমদ, যাদেরকে মা নিজের সন্তানের মতই ভালবাসতেন ওরাও ঐ টেনে কাদিয়ান পর্যন্ত এলো আমার ভাই শুকরুল্লাহ্ খান ও আমি ট্রেনে মায়ের কামরায় রইলাম। মাঝে দু'একবার পাশ ফেরা ছাড়া মা মোটামুটি শান্তিতেই ঘুমাচ্ছিলেন মনে হচ্ছিলো। রাত এগারোটার দিকে তিনি আমাদের ঘুমাতে যেতে বললেন। শুকরুল্লাহ্ খান উঠে গেলো। মাকে একা পেয়ে আমি বললাম, মা আপনি আমাকেতো বিশেষ ভাবে কিছু বলে গেলেন না। মা বললেন, কাউকেই তো বিশেষ ভাবে কিছু বলে যাচ্ছি না।

আমিতো আর সাধারণ কেউ নই, আমরা একাত্ম ছিলাম তা ঠিক।

আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি পৃথিবীর সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন এবং পরলোকে পাড়ি দেওয়ার পথে আছেন।

এ যেন কল্পনার রাজ্য থেকে বাস্তবের রাজ্যে ফিরে যাওয়া। এই প্রক্রিয়াটি ছিল খুবই ধীর, খুব সৌম্য। অসুস্থতাকালীন সম্পূর্ণ সময়টুকুতে তিনি কখনো ব্যাথা

অনুভব করেননি। কখনো ভয়ের চিহ্নও দেখা যায় নি । যখন বুঝতে পেরেছেন যে পরম প্রভূর ডাক এসেছে, তাতে আগ্রহভরে, আনন্দচিত্তেই সাড়া দিয়েছেন। এখন তার আত্মা তার দেহকে বিদায় জানাচ্ছিলো, সেই দেহ যা তাকে পচাত্তর বৎসর ধরে বেঁধে রেখেছিলো, তাকে ব্যস্ত রেখেছিলো। আমি মাকে শান্তিতে রাখার জন্য উঠে চলে এলাম।

বিসমিল্লাহ্ বেগম অমৃতসরে এলেন মা ইশারায় জানালেন যে তিনি আশা করছেন আমার শ্বাশুড়ী আমার ছোট বোনের ক্ষেত্রে মায়ের অভাব পূরণ করবেন। কেননা ছোট বোনটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী, সব সময় আল্লাহ্র ইবাদত ও দান খয়রাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতো। যে প্রতিনিধি কাসুর থেকে দাস্কা গিয়েছিলো কাফনের কাপড়ের বক্স আনার জন্য, সেও উপস্থিত হলো এবং জানালো যে ঐ বক্সটি খুঁজে বের করতে পারে নি। তাকে আরো বিস্তারিত ভাবে নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়। সেদিন বিকালেই সেই বক্স কাদিয়ানে পৌঁছে যায়।

সকাল দশটার আগেই ট্রেন কাদিয়ানে পৌঁছে। আমি মাকে জানালাম, মা আমরা কাদিয়ান পৌঁছে গেছি। মা আগ্রহ ভরে বললেন, বিসমিল্লাহ্। বিসমিল্লাহ্। সেদিন ছিলো রোববার, ১৫ মে, বৎসরের সবচেয়ে গরম সময়। সেলুনটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ছিলো, আমি মাকে জিজ্ঞাস করলাম তিনি সেলুনেই থাকতে চান কি না। তিনি ঘরে যেতেই পছন্দ করলেন। মায়ের আগের নির্দেশ মতই একতলা বাসার ঘরেই মায়ের বিছানা পাতা হলো। মা যেখানে আসতে চেয়েছিলো সেখানে আসতে পেরেছেন। এতে তিনি বেশ খুশী হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ তার কোন আশাই অপূর্ণ রাখেন নি। কাদিয়ান প্রতিশ্রুত মসীহের জন্মভূমি, ঐশী আলো, ঐশী কৃপায় ধন্য। কিছু সময় পরই হয়তো তার নশ্বর দেহ তার জীবন সঙ্গীর পায়ের নীচে ভূমিতলে শয্যা গ্রহণ করবে। তার আত্মা সেই পালঙ্কে করে দোজাহানের মধ্যবর্তী ক্ষেত্র পারি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।

দাস্কায় যেহেতু খবর গিয়েছিলো যে মা কাদিয়ানে এসেছেন, দলে দলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা সেদিন বিকালেই আসতে শুরু করলো। এদিকে সময় যতই পার হচ্ছিল মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসও ধীর হয়ে আসছিলো। কিন্তু তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলো। বশীর আহমদ ইজাজ আহমদকে ব্যাপারটি লক্ষ্য করে দেখতে বললো। তারপর একটি পাঞ্জাবী শ্লোক আউড়ালো ঃ একজন দরবেশকে চেনা যায় তার চেহারায় ঐশী আলোর ঝলকানিতে।' রাত ঘনিয়ে এলো। এটা যে এক আশীসপুর্ণ রাত তা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিলো। ফেরেশতাদের অবতরণও অনুভূত হচ্ছিলো। আমার দাদার আমল থেকে যে আমাদের বাড়ীতে পারিবারিক বাবুর্চি হিসাবে কাজ করতো, এমনকি বাবা মায়ের

সঙ্গে হজ্জে পর্যন্ত গিয়েছিলো এবং এখনো আমাদের পরিবারের অনুগত ও ভক্ত ছিলো–সেই মিয়া জুম্মন মায়ের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার অনুমতি চাইলো। কিছুক্ষণ থেকে মা অচেতন ছিলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে সালাম করার পর মায়ের চোখের পাতা সাড়া দিলো। রাত তিন টার সময় মা সম্পুর্ণ অচেতন হয়ে পড়েন। প্রায় অনুভব করা যায় না তেমন ভাবে রহমান শ্বাস-প্রশ্বাসই ছিলো তার জীবিত থাকার একমাত্র লক্ষণ। দীর্ঘ পথযাত্রার পর এই ভোরেই তিনি পরপারে যাত্রা সমাপ্তি করেন।

সকাল আটটার সময় গোলাম নবী এসে খবর দিলো যে নাস্তা প্রস্তুত। কিন্তু কাউকেই খেতে রাজী করানো গেল না। আমি তাকে বললাম, আমার কাছে এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসো। যখন অতিথিরা জানবে আমি খাচ্ছি, তারা হয়তো খাওয়ার ব্যাপারে রাজী হতে পারে। আমার স্ত্রী কিন্তু অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি মায়ের সেই স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম **"যখন ছেলেমেয়েরা নাস্তা শেষ করবে"**। এক ঘন্টা পর গোলাম নবী খবর দিলো যে প্রত্যেকে নাস্তা খাওয়া শেষ করেছে। মার হৃদ স্পন্দন থেমে গেলো। "পৃথিবীর উপরের সব বস্তুরই বিনাশ ঘটবে–কেবল মাত্র সেইগুলো ছাড়া মা মহামহিমান্বিত ও পরম গৌরবময় প্রভূর আশ্রয়ে আছে (কুরআন ঃ ৫৫ ঃ ২৮)।"

দিল্লীতে ডাক্তাররা বলেছিলো যে মায়ের হৃদযন্ত্র চল্লিশ মিনিটের বেশী কাজ করবে না। ঐশী কৃপা তাকে চল্লিশ ঘন্টা সময় মঞ্জুর করেছিল।

বিসমিল্লাহ্ বেগমের তত্ত্বধানে মার দেহ গোসল করানো হয়েছিলো। যখন সবকিছু সারা হলো, আমাকে ডাকা হলো শেষ বারের মত তাকে দেখার জন্য। এক অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্যমন্ডিত ছিলো সেই মুখ। মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো না যে তার বয়স পঁচিশের বেশী, শুধুমাত্র কপালের কিনারায় এক চিলতে পাকা চুলের আভাস ছাড়া। নধর কান্তি সৌম্য মুরতি ছিলো সেই মুখমন্ডলে। ঠোঁট দু'টি ঈষৎ হাসির আভায় সামান্য ফাঁক হয়েছিলো। এক সেকেন্ডের বেশী সেই গৌরবোজ্জল দিব্যকান্তি চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারিনি। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

১৬ই মে সোমবার দুপুরে তার মরদেহ বেহেশ্‌তী মাকবেরা কবরস্থানে তার স্বমীর পায়ের নীচে স্থাপন করা হলো। তার শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিলো সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ, সাহেবজাদা মির্যা শরীফ আহমদ সহ মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিবারের আরো অনেক সদস্যবৃন্দ।

খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আহমদীয়া আন্দোলনের ২য় খলীফা) তখন সিন্ধুতে ছিলেন। সেখানে থেকে আল ফজলে প্রকাশের জন্য তিনি নিম্নের বিবৃতিটি লিখে পাঠানঃ

চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানের মাতার ইন্তেকালের শোক সংবাদ এসেছে। আমি দুঃখিত যে কাদিয়ান থেকে এতো দূরে আছি এত দূর থেকে গিয়ে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবো বলে মনে হয় না। এটা আমাকে দারুন ব্যথিত করছে। এই শোক সংবাদ পাওয়ার পরপরই আমি যথা সময়ে কাদিয়ান পৌঁছাতে পারবো কিনা এ সংবাদ আনতে একজন লোককে মোটর কারে করে মিরপুর পাঠিয়েছি। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে তার জানাযায় ইমামতি ও তার দাফনে অংশ নেওয়ার আমার ইচ্ছা পুরণ হতে পারে। আর তা না হলে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার উপরই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

তাঁর স্বামী চৌধুরী নাসরুল্লাহ্ খান অত্যন্ত মুখলেস ও উঁচু মোকামের আহমদী ছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আমার ডাকে সাড়া দিয়ে এই আন্দোলনের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি কাদিয়ানে চলে আসেন এবং আমাকে সাহায্য করতে থাকেন। সেই হিসাবে তার স্ত্রী আমার কাছে অনেক পাওনা এবং আমার মাধ্যমে জামাআতের কাছেও। এ ছাড়াও চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান প্রথম জীবন থেকেই যিনি সংবেদনশীলতা ও সৌভাগ্যের গুণাবলীতে ভূষিত, আমার খেলাফতের প্রথম সময় থেকেই আমার প্রতি ভালবাসা ও পরম বিশ্বস্ততা ঘোষণা করেছিলেন। তারই মা আজ ইন্তেকাল করেছেন। সেই হিসাবেও আমার প্রতি তার দাবী আছে। যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জামাতের সাথে অধিকাংশ মহিলাদের সম্পর্ক পরোক্ষভাবে যেমন পিতা, সন্তান বা ভাই-এর মাধ্যমে। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ঐ সমস্ত বিরল রমণীদের একজন যাদের জামাআতের সাথে সরাসরি সম্পর্ক আছে। তার স্বামীর পূর্বেই তিনি জামাআতে দাখিল হয়েছিলেন এবং সংকটের সময় তিনিই আগে খলীফার কাছে বয়আত নিয়েছিলেন। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তার প্রচন্ড ভক্তি ও উৎসাহের প্রমাণ তিনি সবার আগে দিতেন। জামাআতের চাঁদা গরীব দুঃখীদের প্রয়োজনে তার কদম ছিলো সবার আগে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে দোয়ায় রত হয়ে যাওয়ায় সত্য স্বপ্নের ধারা দিয়ে তার জীবনকে সম্মানিত করা হয়েছিল। তার স্বপ্নের ভিত্তিতেই তিনি জামাআতে যোগ দিতে পেরেছিলেন এবং সত্য স্বপ্নের ফলেই তিনি খেলাফতের আনুগত্যও করতে পেরেছিলেন।

একটি সুন্দর ঘটনার কথা আমি ভুলতে পারি না। অনেকের জন্য এটা একটি আদর্শ উদাহরণ হিসাবে থাকবে। আহরারদের আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন

একজন আহরার বিরুদ্ধবাদী মিয়া শরীফ আহমদকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে জখম করেছিলো। একথা জানতে পেরে তিনি দারুন মর্মাহত হন। তিনি বার বার চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানকে শুধু যে নিজের আন্তরিক ব্যথার কথা বলতো তা-ই নয়, বরং হযরত উম্মুল মু'মিনিনের মনোব্যথার কথা মনে করে তার যে অত্যন্ত কষ্ট হতো তাও বলতেন। একদিন তিনি জাফরুল্লাহ্ খানকে বললেন ; লেডি উইলিংডন তো বললেন যে তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন। একদিন ভাইসরয়ের সামনে লেডী উইলিংডনকে আমার এই মনোব্যথার কথা বলার জন্য বন্দোবস্ত করা যাবে? জাফরুল্লাহ্ খান বললেন, যা কিছু বলার তা তার মাকে নিজেকেই বলতে হবে। তিনি জাফরুল্লাহকে আশ্বাস দিলেন যে তাই হবে ঃ আল্লাহ্ই তাকে সাহায্য করবেন। কুরআন শরীফের অনুশাসন মতে তার মত বয়সে রমণীদের ক্ষেত্রে পর্দার কিছুটা শিথিলীতা আছে। – তাই তার ইচ্ছা মাফিক একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান দোভাষী হিসাবে কাজ করেছিলেন। লেডী উইলিংডনও সেখানে ছিলেন।

ভাইসরয়কে তিনি বলেছিলেন ; আমি একজন গ্রামের মেয়ে। সরকার ও তার শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আমার তেমন কিছু জানা নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন যে, বৃটিশরা ভাললোক তাই তাদের জন্য অন্তর থেকে দোওয়া আসতো। যখন বৃটিশদের দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা হয়েছিলো তখন চোখের পানি দিয়ে দোয়া করে ছিলাম ঃ প্রভূ তাদের রক্ষা করো, সাহায্য করো এবং দুর্ভাগ্য থেকে উদ্ধার করো। আর এখন আমাদের লোকদের প্রতি কেমন ব্যবহার করা হচ্ছে, বিশেষতঃ কাদিয়ানে। তাই যদিও হযরত মসীহ্ মাওউদের নির্দেশ মতো আমি এখনো দোয়া করি, কিন্তু যেহেতু আমার মন খুশী নয় তাই সেই দোওয়া অন্তর থেকে উঠে আসে না। আমরা কি করছি যে আমাদের প্রতি এই আচরণ?

এই সাধারণ বাক্যগুলিতেই লেডী উইলিংডন এতো বিচলিত হয়ে পড়েন যে বক্তাকে তিনি নিজের দিকে টেনে নিয়ে তাকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন এবং ভাইসরয়কে এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এরকম কয়জন লোক আছে, যারা জামাআতের পক্ষ থেকে নিজেদের ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধকে এতো সাহসের সাথে ব্যক্ত করতে পারবে বা করে? মহান আল্লাহ্ তার বিদেহী আত্মাকে নিজের দয়ার সাগরে গ্রহণ করুন এবং তার উপর নিজের মহিমা ঢেলে দিন। আমীন।

তার সন্তানদের মধ্যে তিনি চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে আল্লাহ্ তাকে অন্যদের চেয়ে বেশী সম্মানিত করেছেন এবং তিনিও নিজের মাকে অন্যদের চেয়ে বেশী মর্যাদা দিতেন।

মজলিশে শূরার অধিবেশনের সময় জাফরুল্লাহ্ খানের সঙ্গে তিনি প্রায়ই আসতেন। দু'তিন বার তিনি আমার সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। তিনি খুবই হাসিখুশী মানুষ ছিলেন। কিন্তু বলতেন যে তার ভেতরে এক বিরাট শূন্যতা অনুভব করেন। এক স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি এপ্রিল মাসে ইন্তেকাল করবেন। স্বপ্ন অনেক সময়ই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। মনে হয় এর অর্থ ছিলো এই যে, গুরতর অসুস্থতায় তার মৃত্যু এপ্রিল মাসেই শুরু হওয়ার কথা। তাই এপ্রিল মাসের এতো কাছাকাছি তার মৃত্যুই সেই স্বপ্নের সত্যতার এক নিশ্চিত প্রমাণ বলে ধরা যায়।

দু'এক বৎসর আগে আমি নিজে একবার একটা স্বপ্নে দেখেছিলাম যে আমি যেন আমার অফিস ঘরে বসে আছি এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান, যাকে দেখতে মনে হচ্ছিলো এগারো বারো বৎসর বয়সের, আমার সামনে সটানভাবে শোয়া অবস্থায় আনা হলো, তার মাথাটি যেন উপর দিক থেকে কেউ তুলে ধরে আছে। তার এক পাশে আসাদুল্লাহ্ খান। তাদের দু'জনকে আট নয় বৎসরের বলে মনে হচ্ছিলো। তিন জনই আমার দিকে মুখ করা অবস্থায় ছিলো এবং আমার সঙ্গে কথা বলছিলো। আমার বোধ হচ্ছিলো যেন ওরা আমারই সন্তান। ওরাও আমার কথাগুলো মনোযোগ ও গভীর আন্তরিকতার সাথে শুনছে। আমি তাদের সাথে কথা বলছিলাম এমনভাবে যেমন বাড়ীতে ঘরোয়াভাবে সন্তানদের সাথে লোকে কথাবার্তা বলে। হয়তো এই স্বপ্নে তাদের মায়ের মৃত্যুর ইঙ্গিত ছিলো। কেননা এটা বিধাতার চিরন্তন নিয়ম যে যখন এক পিতা মাতাকে সরিয়ে নেওয়া হয় তখন অন্য পিতামাতা সেই স্থান দখল করে নেয়।

মৃতার পিতা একজন আহমদী ছিলেন এবং তার ভাই দাতা জাইদকার চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খানও একজন খুব মুখলেস ও উদ্যোগী আহমদী। তিনি সেখানকার জামাআতের আঞ্চলিক আমীর। প্রথম খলীফা সাহেবের সময় থেকেই তিনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রত্যেক সময়েই তার উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তিনি প্রথম এগিয়ে এসেছেন।

আমি দোয়া করি মহামহিম আল্লাহ্ এই পরলোকগতাকে তার নিজের কৃপায় আপন সান্নিধ্য দান করুন এবং তার পরিবারের সদস্যদের তার দোয়ার সুফল থেকে যেন বঞ্চিত না করেন এবং তাদের জন্য তার দোয়া সমূহ যেন তার মৃত্যুর পরও কবুল হতে থাকে।

তার কবরের ফলকের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ নিজেই নীচের এই বাক্যগুচ্ছটি লিখে দিয়েছিলেন ঃ-

"চৌধুরী নসরুল্লাহ্ খান (রাঃ) এর স্ত্রী এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানের মাতা সত্য স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। তার স্বপ্নের মাধ্যমেই তিনি প্রতিশ্রুত মসীহকে চিনবার সৌভাগ্য লাভ করে ছিলেন এবং নিজের স্বামীর পূর্বেই বয়আত গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বপ্নের দিকনির্দেশনাতেই তিনি খেলাফতের প্রশ্নে সত্য পথে পরিচালিত হয়ে স্বামীর পূর্বেই আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। ঈমানের ক্ষেত্রে তার নিষ্ঠা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের, সত্য প্রচারেও তিনি ছিলেন নির্ভীক। অভাবীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা, সরল ও কঠোর সংযমী জীবন যাপনের দূর্লভ গুণাবলীতে তিনি ভূষিত ছিলেন। অত্যন্ত পুণ্যবতী স্ত্রী ও মমতাময়ী মা ছিলেন তিনি। আল্লাহ্ তাআলা তার ও তার স্বামী যিনি জামাআতের একজন একান্ত বিশ্বস্ত ও সম্মানিত খাদেম ছিলেন, তাদের উভয়ের উপর কল্যাণ রাশি বর্ষণ করুন এবং আপন সান্নিধ্যে তাদের স্থান দিন এবং তাদের সন্তান সন্ততিদের নেগাহ্বান হোন, আমীন।"

ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো তার শোক বাণীতে লিখেছিলেন ঃ– "আপনার মত জীবন্ত ধর্ম বিশ্বাসীকে আমি কি সান্তনা দিতে পারি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে পেরেছেন তেমন অবস্থায় আপনাকে দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য তার হয়ে ছিলো একথা মনে করে আপনি হয়তো কিছুটা সান্তনা পেতে পারেন।"

এর আঠারো মাস পরে লন্ডনের লেডী উইলিংডন আনোয়ার আহমদ কাহলুনকে বলেছিলেন ঃ "মায়ের মৃত্যু হয়তো তাকে বড় একা কড়ে দিয়েছে। ওরা দু'জন একে অন্যের প্রতি ছিল অনুগত প্রাণ।"

বেশ অনেক বৎসর পরের কথা। আমার খুব প্রিয় এক বন্ধু ডাঃ ইটালো চুইসি, তিনি জামাআতের একজন একনিষ্ঠ ও অনুগত সদস্য ছিলেন এবং যদিও মাকে চিনতেন না তবে আমাদের মাঝে যে দৃঢ় বন্ধন ছিলো সে কথা জানতেন, তিনি মায়ের কবর জিয়ারত করেন। যখন তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মা ও বাবার জন্য দোওয়া করছিলেন, তখন দেখেন মায়ের কবরের পায়ের দিক থেকে কবরের এক টুকরা মাটি যেন কাল রং ধরেছে, যেন এটা ভিজে গিয়েছে। সেই টুকরাটা বড় হতে থাকলো। তার পর তার মধ্য থেকে ফোটা ফোটা পানি বেরুতে শুরু করলো। সেই সূক্ষ্ম ধারার পানি বাড়তে শুরু করলো ও তার দিকে বইতে শুরু করলো এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে তা এক নির্মল স্বচ্ছ জলের ধারা হয়ে উঠলো। যে মুহূর্তে তার দোয়া শেষ করলো, তার এই দিব্যদর্শনও শেষ হয়ে গেলো।

যখন মা মারা যান তখন আমার বয়স পয়তাল্লিশ বৎসর। তারপর আরো তেতাল্লিশ বৎসর পার হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ্র কৃপায় জীবন এখন পরিপূর্ণ। কিন্তু মায়ের স্মরণ ও আকুল আকাঙ্খার গোপন ফল্গুধারা এখন আগের মতই

বহমান। মায়ের আদর আমাকে কোমল করে দিতে কখনো ব্যর্থ হয় না, আর সন্তানদের ব্যাপারে অন্যদের বিবেচনাহীনতা আমাকে দারুন আঘাত করে। জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও আমার পিতা-মাতা ও সব পুণ্যাত্মাদের সাথে মিলিত হওয়ার আশায় আমি উদ্দীপ্ত থাকি। সেই আশা ঐশী প্রতিশ্রুতি থেকেই উদ্ভূত ঃ **"সেই সব বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে যাদের সন্তানরা ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে, তাদের সন্তানদের আমরা তাদের সাথে মিলিত করে দেবো এবং তাদের কর্মফলের পুরস্কার থেকে তাদেরকে কিছুমাত্র কম দেওয়া হবে না"** (কুরআন ঃ ৫২ ঃ ২৩)।

হে আল্লাহ্ তুমি আমার পিতা-মাতার কবরে তোমার করুণার বারিধারা বর্ষণ করো, তাদের তোমার পূর্ণ জ্যোতির আঁচলে জড়িয়ে নাও ও তোমার অপার অসীম করুণা রাশি তাদের উপর বর্ষাও। আমীন।